বায়তুশ শরফের পীর সাহেব হযরত শাহ
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর

নির্বাচিত প্রবন্ধ

সম্পাদনা

মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী

তথ্য ও উপাত্ত সম্পাদনা

মু. সগির আহমদ চৌধুরী

Est. 1998
আল্লামা শাহ্ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন
ALLAMA SHAH ABDUL JABBAR FOUNDATION

আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন

বায়তুশ শরফের পীর সাহেব (রহ.)-এর নির্বাচিত প্রবন্ধ
সম্পাদনায়: মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী
তথ্য ও উপাত্ত সম্পাদনায়: মু. সগির আহমদ চৌধুরী

পরিবেশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার আশ শরফ একাডেমির পক্ষে
মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-হুসাইন, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

প্রকাশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন
বায়তুশ শরফ জিলানী মার্কেট, চট্টগ্রাম–৪১০০

প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ: যিলহজ ১৪২৭ হি. = জানুয়ারি ২০০৭ খ্রি.
দ্বিতীয় প্রকাশ: ১ রমযান ১৪৩৯ হি. = ১৫ মে ২০১৭

প্রকাশনা ক্রমিক: ১৪৩, বিষয় ক্রমিক: ০৫

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

আপনার কপির জন্য যোগাযোগ করুন
বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম
আল-মানার লাইব্রেরী, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
মুহাম্মদী লাইব্রেরী, প্রধান সড়ক, কক্সবাজার
বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী, তেজগাঁও থানার সামনে, ফার্মগেইট, ঢাকা

মূল্য: ১৪০ [একশত চল্লিশ] টাকা মাত্র

***Nirbachito Probando (The Compilation of the Articles of the Pir Saheb Baitush Sharaf)*:** By Shaykh Shah Muhammad Abdul Jabbar, Edit By: Mohammad Abdul Hai Nadvi, Published By: Allamah Shah Abdul Jabbar Academy, Baitus Sharaf, Chittagong-4100, Bangladesh, Price: 140

e-mail:abdulhai.nadvi@yahoo.com
saajctg@yahoo.com
www.saajbd.org

পূর্বকথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্যে, যিনি তাঁর অপূর্ব সৃষ্টিকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। অসংখ্য দরুদ ও সালাম বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি, যাঁর মাধ্যমে আমরা হেদায়তের আলো পেয়েছি।

শৈশবকাল থেকে দীনী ইলম অর্জনের লক্ষ্যে দেশ-বিদেশের বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বরেণ্য শিক্ষকদের সান্নিধ্য পাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। তাঁদের ভাষণ ও লিখিত গ্রন্থসমূহ মানবজাতির জন্য মহামূল্যবান সম্পদ ও হেদায়তের প্রজ্জ্বলিত মশাল হিসেবে বিবেচিত বলে আমার বিশ্বাস। এ বিশ্বাস থেকে নিজে কিছু লেখা-লেখি ও পুস্তক প্রকাশনার প্রতি আগ্রহ জন্মেছে।

উপ-মহাদেশের দলনিরপেক্ষ মহান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামায় লেখাপড়া করতে গিয়ে সেখানকার দীনী পরিবেশ ও দাওয়াহ বিভাগের বহুমুখী কার্যক্রম আমার মনোবাসনাকে আরও তীব্রতার করেছে। তাই প্রকাশনা হিসেবে বেছে নিয়েছি এদেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম আধ্যাত্মিক সাধক ও সমাজসংস্কারক বায়তুশ শরফের পীর সাহেব, হাদীয়ে যামান, হযরত শাহ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলনের।

ইতঃপূর্বে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর নির্বাচিত লেখা নিয়ে *মলফুযাতে পীর সাহেব বায়তুশ শরফ* নামে একটি গ্রন্থ ১৯৯২ সালে প্রথমবারের মতো প্রকাশ করেছি। উক্ত গ্রন্থের সাথে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ নিয়ে নতুন আঙ্গিকে নির্বাচিত প্রবন্ধ নামে গ্রন্থটি প্রকাশ করছি। এ পুস্তকটি পাঠে মহানবী (সা.)-এর সুমহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ইলমে

তাসাওউফের গুরুত্ব, তরীকতের প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য অনুধাবনে পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ সহজেই সক্ষম হবেন বলে আমার বিশ্বাস।

বইটির শেষ ভাগে গুরুত্বপূর্ণ দুটি ভাষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। গ্রন্থটি প্রকাশনায় প্রিয় ভাই জনাব মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ যে সহযোগিতা করেছেন এর প্রতিদানে মহান আল্লাহ তাঁকে অশেষ রহমত দান করুন।

বইটি প্রকাশে আমাদের অজ্ঞতাবশত ভুল-ত্রুটি থেকে যেতে পারে। এ ব্যাপারে আপনাদের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি। পরিশেষে বইটি পাঠ করে কেউ যদি সামান্যতমও উপকৃত হন তবে একান্ত দুআয় আমাকে স্মরণ করার আবেদন করছি।

আরযগুযার

মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী

৩০ জানুয়ারি ২০১৭
চট্টগ্রাম

সূচিপত্র

শানে রিসালত (সা.) ৭
হযরত মুহাম্মদ (সা.) খুলুকে আযীম ১৬
নূরুম মিনাল্লাহে ওয়া নূরুম মুবীন.....২৫
মানবতার উসওয়ায়ে হাসানা ৩৪
উত্তম স্বভাব ৩৪
লেনদেনে সততা..... ৩৫
সত্যবাদিতা..... ৩৬
ওয়াদা পালন ৩৭
ধৈর্য ও ক্ষমা ৩৮
ইসার বা ত্যাগ ৪০
মেহমানদারি..... ৪০
হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইহসানে আযীম ৪২
সর্বোত্তম জিহাদ..... ৪৮
ইসলামে নামের গুরুত্ব ৫৫
প্রগতির নামে বিধর্মীদের কোনো প্রথা ধারণ, গ্রহণ ও পালন করা সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্য ৫৯
লেবাস-পোষাক ৫৯
নারীর মাথার চুল ৬০
নারী পুরুষের আর পুরুষ নারীর লেবাস পরিধান করা ৬০
পুরুষের দাড়ি ৬০
পুরুষের মাথার টুপি ও মেয়েদের মাথার গোমটা ৬০
বাড়িতে কুকুর পালা ও ঘরে মূর্তি এবং ছবি রাখা.....৬১
মানুষের শরীরের দশটি সুন্নাতে আম্বিয়া (আ.).....৬১
মেয়েদের হিন্দুয়ানী কুপ্রথার অনুকরণ ৬২
ডান ও বাম হাতের ব্যবহার ৬২

ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যবসা-বাণিজ্য..... ৬৩
ঈদুল ফিতরের তাৎপর্য.....৬৬
উপমহাদেশে দীন প্রতিষ্ঠায় ওলামায়ে কেরামের ভূমিকা ৬৯
যুগে যুগে পীর-মাশায়েখের অনন্য অবদান ৭৪
তাসাওউফের উৎপত্তি ৭৭
নামায সব ইবদাতের শ্রেষ্ঠ ইবাদত..... ৮২
নামাযের বর্ণনা ৮৬
সাহচর্যের গুরুত্ব ও উপকারিতা ৮৮
মানব জীবনে তরীকত ও আধ্যাত্মিক সাধনার প্রয়োজনীয়তা.....৯৪
ইয়াকীন ইখলাস ও ইহসানের ভিত্তিতে ইবাদত করে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে হবে
.....১০৩

শানে রিসালত (সা.)

নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ (সা.) মানবজাতির কাছে একটি উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কালামে ইরশাদ ফরমায়েছেন,

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ۙ يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ
وَ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَ يَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

'(হে মানবকুল!) তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নূর (হুযুর সা.) এবং একটি স্পষ্ট কিতাব (কুরআন শরীফ) এসেছে। আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তাদেরকে এর মাধ্যমে তিনি সঠিক পথ প্রদর্শন করেন এবং আল্লাহর ইচ্ছে অনুযায়ী তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে সঠিক পথের দিশা প্রদর্শন করেন।'[১]

তাফসীরে আবুস সউদ, *ফাতহুল বায়ান* ও *গারায়িবুল কুরআনে* লিখিত আছে যে, এ আয়াতের মধ্যে নূরের অর্থ জনাব রাসূলুল্লাহ (সা.)।[২] প্রকৃতপক্ষে হুযুর (সা.)-এর নূর সূর্যের আলো থেকে লক্ষ গুণে বেশি উজ্জ্বল। কেননা সূর্যের আলো একটি নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছার পরে কমতে শুরু করে। কিন্তু হুযুর (সা.)-এর নূর দিবা-রাত্রি ক্রমশ বাড়তে থাকে।

পবিত্র কালামে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,

وَ لَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ۝

---

[১] আল-কুরআন, *সুরা আল-মায়িদা*, ৫:১৫–১৬

[২] (ক) আবুস সাউদ আল-ইমাদী, *ইরশাদুল আকলুস সালীম ইলা মাযায়াল কুরআনিল করীম*, খ. ৩, পৃ. ১৮; (খ) সিদ্দীক হাসান খান, *ফাতহুল বায়ান ফী মাকাসিদিল কুরআন*, খ. ৩, পৃ. ৩৭৮; (গ) আন-নায়সাপুরী, *গারায়িবুল কুরআন ওয়া রাগায়িবুল ফুরকান*, খ. ২, পৃ. ৫৭০

‘তাঁর পূর্বের অবস্থা থেকে পরের অবস্থা উন্নত।’[১]

তাঁর সহধর্মিণী হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন,

لَنَا شَمْسٌ وَلِلْآفَاقِ شَمْسٌ * وَشَمْسِيْ خَيْرٌ مِنْ شَمْسِ السَّمَاءِ

وَشَمْسُ النَّاسِ تَطْلَعُ بَعْدَ فَجْرٍ * وَشَمْسِيْ تَطْلَعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ

‘আমার একটি সূর্য আছে এবং আকাশেরও একটি সূর্য আছে। আমার সূর্য আকাশের সূর্য থেকে অধিক উত্তম। কেননা লোকদের সূর্য সকাল বেলা উদিত হয় আর আমার সূর্য এশার পর উদিত হয়।’

এখানে তিনি তাঁর সূর্য বলতে হুযুর (সা.)-কে বুঝিয়েছেন। যেটা প্রকৃতপক্ষে হেদায়তের সূর্য। হাদীস শরীফে এসেছে,

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ: «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُوْرِيْ».

‘হযরত জাবির (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন।’’[২]

আল-মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে,

إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ لَمَّا خَلَقَ نُوْرَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ أَنْوَارِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، فَغَشِيَهُمْ مِنْ نُوْرِهِ مَا أَنْطَقَهُمُ اللهُ بِهِ، فَقَالُوْا: يَا رَبَّنَا، مَنْ غَشِيَنَا نُوْرُهُ؟ فَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: هَذَا نُوْرُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، إِنْ آمَنْتُمْ بِهِ جَعَلْتُكُمْ أَنْبِيَاءً، قَالُوْا: آمَنَّا بِهِ وَبِنُبُوَّتِهِ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: أَشْهَدُ عَلَيْكُمْ؟ قَالُوْا: نَعَمْ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَاۤ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِيْ ؕ قَالُوْۤا اَقْرَرْنَا ؕ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿۸۱﴾ ﴾ [آل عمران: ۸۱].

‘যখন আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নূরকে সৃষ্টি করলেন তখন তাঁর নূরকে সম্বোধন করে বললেন, ‘তুমি অন্যান্য

---

[১] আল-কুরআন, *সূরা আয-যুহা*, ৯৩:৪

[২] আল-কাস্তাল্লানী, *আল-মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া বিল-মানহিল মুহাম্মাদিয়া*, খ. ১, পৃ. ৪৮

নবীর নূরকে দেখে আস।' যখন তাঁর নূর অন্যান্য নবীর নূরকে দর্শন করল তখন এগুলোকে ম্লান করে দিল। নবীদের নূর তা দেখে আল্লাহ তাআলাকে প্রশ্ন করল, হে বারে ইলাহী! এটি কার নূর? উত্তরে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করলেন, 'এটি মুহাম্মদ (সা.)-এর নূর। তোমরা যদি এ নূরের ওপর বিশ্বাস স্থাপন কর তখন আমি তোমাদেরকে নুবুওয়াত দান করব।' তখন সমস্ত নবী তাঁর ওপর ঈমান আনলেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তাআলা নবীদের থেকে এর প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত যা কিছু দিয়েছি তার শপথ, আর তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থক রূপে যখন একজন রাসূল আসবে তখন নিশ্চয়ই তোমরা তাঁকে বিশ্বাস করবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে।''[১]

এর থেকে বোঝা যায় যে, রোজ আযলের মধ্যে আল্লাহ তাআলা নবীদের থেকে তাঁর নুবুওয়াতের সাক্ষ্য নিয়েছেন। কিয়ামতের দিন হুযুর (সা.) সমস্ত নবীর নুবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করলেই তাঁরা আল্লাহর কাছ থেকে মুক্তি পাবেন। পবিত্র কালামে বর্ণিত হয়েছে,

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿٤١﴾

'কি অবস্থা হবে যখন আমরা প্রত্যেক নবী উম্মতের জন্য একটি সাক্ষী নিয়ে আসব এবং এ সাক্ষীদের ওপর আপনাকে সাক্ষী নিযুক্ত করব।'[২]

অর্থাৎ আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.) সমস্ত নবীর সত্যতার ওপর সাক্ষ্য প্রদান করবেন এবং বলবেন যে, এ সমস্ত পয়গাম্বরেরা তাঁদের উম্মতদের কাছে যথাযথভাবে রেসালতের দায়িত্ব পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। আল্লামা জালালুদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.)-এর লিখিত *আল-খাসায়িসুল কুবরা* নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে,

إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ لَمَّا أَخَذَ مِنْ بَنِيْ آدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَاتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ: «أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ»؟ كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ أَوَّلُ مَنْ قَالَ: «بَلَىٰ».

'যখন আল্লাহ তাআলা আদম সন্তনের আত্মাসমূহ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন এবং তাঁদের নিজেদের ওপর নিজেদের সাক্ষ্য গ্রহণ

---

[১] আল-কাস্তাল্লানী, *আল-মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া বিল-মানহিল মুহাম্মাদিয়া*, খ. ১, পৃ. ৪৪–৪৫

[২] আল-কুরআন, *সুরা আন-নিসা*, ৪:৪১

করলেন এবং বললেন, 'আমি কি তোমাদের রব নই'? এ সময় সর্বপ্রথম হযরত (সা.) বলেছিলেন, 'নিশ্চয় আপনি আমাদের রব।''[১]

রোজে আযলের মধ্যে সর্বপ্রথম হুযুর (সা.)-এর নূর এবং আত্মা আল্লাহর স্বীকৃতি প্রদান করেছিলেন। কেননা তিনি ছিলেন সকলের ইমাম। নবীরা ছিলেন তাঁর মুকতাদী।

আল-মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, যখন আল্লাহ তাআলা আদম (আ.)-এর জন্য বিবি হাওয়া (আ.)-এর বিয়ের কথা সাব্যস্ত করলেন তখন হাওয়া (আ.)-কে মোহর হিসেবে দেওয়ার জন্য মহানবী (সা.)-এর ওপর ৩ বার দরুদ পড়ার কথা ঘোষণা করেন। হযরত আদম (আ.) ৩ বার দরুদ পড়ে মোহরানা আদায় করলেন।[২]

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْ ـخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَ ـمَّا اقْتَرَفَ آدَمُ الْـخَطِيئَةَ، قَالَ: يَا رَبِّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لَـمَا غَفَرْتَ لِيْ، فَقَالَ اللهُ ﷻ: يَا آدَمُ وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَـمْ أَخْلُقْهُ ؟ قَالَ: لِأَنَّكَ يَا رَبِّ لَـمَّا خَلَقْتَنِيْ بِيَدِكَ وَنَفَخْتَ فِيَّ مِنْ رُوْحِكِ رَفَعْتُ رَأْسِيْ فَرَأَيْتُ عَلَىٰ قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ، فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَـمْ تُضِفْ إِلَىٰ اسْمِكَ إِلَّا أَحَبَّ الْـخَلْقِ إِلَيْكَ، فَقَالَ اللهُ ﷻ: صَدَقْتَ يَا آدَمُ، إِنَّهُ لَأُحِبُّ الْ ـخَلْقِ إِلَيَّ وَإِذْ سَأَلْتَنِيْ بِحَقِّهِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ، وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ».

'হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'আদম (আ.) গমের দানা (গন্দম) খেয়ে আল্লাহর গযবে নিপতিত হলে তিনি আল্লাহর কাছে স্বীয় ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য হুযুর (সা.)-কে উসিলা দিয়ে যখন আল্লাহর কাছে দুআ করলেন তখন আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করলেন, হে আদম! তুমি মুহাম্মদ (সা.)-কে কিভাবে চিনতে

---

[১] আস-সুয়ুতী, *আল-খাসায়িসুল কুবরা*, খ. ১, পৃ. ৭

[২] আল-কাস্তাল্লানী, *আল-মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া বিল-মানহিল মুহাম্মাদিয়া*, খ. ১, পৃ. ৫০:

ثُمَّ خَلَقَ اللهُ تَعَالَىٰ لَهُ حَوَّاءَ زَوْجَتَهُ مِنْ ضَلَعٍ مِنْ أَضْلَاعِهِ الْيُسْرَىٰ، وَهُوَ نَائِمٌ، وَسُمِّيَتْ حَوَّاءُ ، لِأَنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ حَيٍّ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ وَرَآهَا سَكَنَ إِلَيْهَا، فَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ : مَهْ يَا آدَمُ! قَالَ: وَلِمَ وَقَدْ خَلَقَهَا اللهُ لِيْ؟ فَقَالُوْا: حَتَّىٰ تُؤَدِّيَ مَهْرَهَا، قَالَ: وَمَا مَهْرُهَا؟ قَالُوْا: تُصَلِّيْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ.

পারলে? তিনি বললেন, হে বারে ইলাহী! আপনি যখন আমাকে সৃষ্টি করে আমার মধ্যে আত্মার সঞ্চার করলেন তখন আমি আরশের ওপর দৃষ্টিপাত করতেই দেখতে পাই যে, আরশের ওপর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) লেখা আছে। আমি মনে করলাম যে, তিনি নিশ্চয় আপনার প্রিয় বন্ধু হবেন, যাঁর নাম আপনার নামের সাথে লেখা রয়েছে। ইরশাদ হলো, হে আদম! তোমার ধারণা সঠিক। আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর উসিলায় তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।"[১]

তাই তো কবি বলেন,

اگر نام محمد را نیاوردے شفیع آدم ☆ نہ آدم یافتے توبہ، نہ نوح از غرق نَجَّیْنَا

ভাবার্থ: 'যদি আদম (আ.) তাঁর দুআর সময় হযরত (সা.)-এর উসিলা দিয়ে তওবা না করতেন তবে না আদম (আ.)-এর তওবা কবুল হতো, না নুহ (আ.) মহাপ্লাবন থেকে মুক্তি পেতেন।'

বুখারী শরীফের মধ্যে রয়েছে কিয়ামতের ভয়াবহ পরিবেশে যখন উম্মতেরা তাদের নবীদের কাছে সুপারিশের অনুরোধ করবে তখন একমাত্র হুযুর (সা.) ছাড়া বাকি সবাই সুপারিশ করতে অপরাগতা প্রকাশ করবেন।[২]

তিনি এমন এক চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, সমস্ত পয়গাম্বরের চরিত্র পূর্ণরূপে তাঁর মধ্যে বিকশিত হয়েছিল। যেমন হযরত শীস (আ.)-এর মা'রিফাত, নুহ (আ.)-এর বীরত্ব, ইবরাহীম (আ.)-এর বন্ধুত্ব, ইসমাঈল (আ.)-এর ভাষা, ইসহাক (আ.)-এর সন্তুষ্টি, সালেহ (আ.)-এর স্পষ্টবাদিতা, লুত (আ.)-এর হিকমত, ইয়াকুব (আ.)-এর সুসংবাদ, মুসা (আ.)-এর শক্তি, আইয়ুব (আ.)-এর ধৈর্য, ইউনুস (আ.)-এর আনুগত্য ও ইয়াহিয়া (আ.)-এর পুত-পবিত্রতা ইত্যাদি।

মহানবী (সা.) যেহেতু আল্লাহর নূরের সৃষ্টি সে কারণে তাঁর চরিত্রের মধ্যে এর সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রতিভাত হয়ে উঠেছিল, যা সাধারণত অন্যান্য সৃষ্টির মাঝে পরিলক্ষিত হয় না। তাঁর হৃদয় আলৌকিক দয়া ও ক্ষমায় পরিপূর্ণ ছিল। শত্রু-মিত্র ভেদাভেদ ছিল না তাঁর মধ্যে। তিনি জীবনে কখনও ব্যক্তিগত অনিষ্টের জন্য একবিন্দু রক্তপাত বা কাকেও প্রহার করেননি। অনেকবার তিনি দুর্দান্ত শত্রু কর্তৃক নানাভাবে উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত

---

[১] (ক) আল-কাস্তাল্লানী, *আল-মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া বিল-মানহিল মুহাম্মাদিয়া*, খ. ১, পৃ. ৫৪–৫৫; (খ) আল-বায়হাকী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত*, খ. ৫, পৃ. ৪৮৯, হাদীস: ২২৪৩

[২] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৬, পৃ. ১৭–১৮, হাদীস: ৪৪৭৬ ও খ. ৮, পৃ. ১১৬, হাদীস: ৬৫৬৫, হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) থেকে বর্ণিত

হয়েছেন। কিন্তু তিনি কখনও ব্যক্তিগত শত্রুতার প্রতিশোধ নিতে প্রয়াসী হননি। যে ইহুদি মেয়েলোকটি তাঁকে আপন গৃহে দাওয়াত করে তাঁর আহার্যে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল, তাকেও তিনি ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমা করেছিলেন। বন্দীকৃত ভীষণ শত্রুকেও পরম বন্ধুর ন্যায় আতিথ্য প্রদান কেবল তাঁর জীবনেই সম্যক প্রকটিত হয়েছে। কুরাইশদের ওপর তিনি সম্পূর্ণরূপে জয়ী হয়েও প্রতিশোধের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি কুরাইশদের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পশু-পাখির প্রতি নবী করীম (সা.)-এর অনুপম দয়া ছিল।

একদিন তাঁর জনৈক শিষ্য বাসা হতে কয়েকটি পাখির ছানা এনেছিলেন। ছানাগুলোর জনক-জননী বাচ্চাদের জন্য ইতস্তত উড়ে বেড়াচ্ছিল। তিনি এ দৃশ্যে ব্যথিত হয়ে শিষ্যকে বললেন, 'এখনই ছানাগুলো বাসায় রেখে আস।'[১]

হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেছেন, 'রাসূল (সা.) কারও নিন্দা করতেন না, নিন্দাবাদ তাঁর প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল। অনিষ্টের পরিবর্তে অনিষ্ট করতেন না, বরং ক্ষমা করতেন। তিনি কখনও অনিষ্টের প্রতিশোধ নিতে সচেষ্ট হননি।' *(সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম)*

তিনি কোনো মুসলমানকে অভিসম্পাত করেননি। কখনও কোনো দাস, ভৃত্য ও পরিচারিকাকে, এমনকি ইতর জন্তুকেও স্বহস্তে প্রহার দেননি।[২]

তাঁর হৃদয় বিনয়, নম্রতা উদারতায় পূর্ণ ছিল। কোনো লোকের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ামাত্রই আস-সালামু আলাইকুম বলে তাঁকে অভিভাদন করতেন। অন্যের সালামের জন্য প্রতীক্ষা করতেন না। প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ মুছাফাহা কালে কখনও তিনি তাঁর হাত আগে সংকুচিত করতেন না। কেউ তাঁকে আহ্বান করলে 'লাব্বাইক' বলে উত্তর দিতেন। একবার তাঁর দুগ্ধমাতা হালিমা স্বীয় স্বামী ও পুত্রসহ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। তিনি হালিমাকে দেখামাত্র অতি ভক্তিভরে 'আমার মা, 'আমার মা' বলে জড়িয়ে ধরেছিলেন এবং অতিসমাদরে স্বীয় চাদর বিছিয়ে তাঁদেরকে বসতে

---

[১] আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ৩, পৃ. ৫৫, হাদীস: ২৬৭৫:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ، فَانْطَلَقَ لِ ـحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا حُمَرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا، فَجَاءَتِ الْحُمَرَةُ ، فَجَعَلَتْ تَفْرِشُ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: «مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا؟ رُدُّوْا وَلَدَهَا إِلَيْهَا».

[২] (ক) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৮১৪, হাদীস: ২৩২৮; (খ) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ৪, পৃ. ২৫০, হাদীস: ৪৭৮৬: عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا ضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا» ।

দিয়েছিলেন। স্বধর্মী-বিধর্মী, মুমিন-কাফির ভেদাভেদ ছিল না তাঁর কাছে। তিনি স্বহস্তে সর্ববিধ পীড়িতের সেবা করতেন। *(সহীহ মুসলিম, সুনানে নাসায়ী ও আবু দাউদ)*

বিধবা ও দীন-দুঃখীর অনুসঙ্গী হয়ে তাদের গৃহকর্মে যোগ দিতে দ্বিধাবোধ করেননি। *(সুনানে নাসায়ী)*

নবী করীম (সা.) দাসপ্রথা রহিত করার উজ্জ্বল আদর্শ রেখে গেছেন। তিনি যুদ্ধবন্দী, ভৃত্য ও দাসের প্রতি সর্বদা সাম্যভাব ও সকরুণ সহানুভূতি প্রদর্শন করতেন। তিনি বলেছেন,

«هُمْ إِخْوَانُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيْكُمْ، فَمَنْ جَعَلَ اللهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ».

'ক্রীতদাসরাও তোমাদের ভাই। নিজেরা যা আহার ও পরিধান করবে তাদেরকে ও সেই আহার ও পরিধান করতে দেবে।'[১]

তিনি ক্রীতদাসের দাওয়াত সানন্দে গ্রহণ করতেন এবং তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁরই সঙ্গে একত্রে ভোজন করতেন। ক্রীতদাস যায়েদকে নিজের পুত্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। অতিথি ও পথিকের জন্য তাঁর দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত থাকতো। আতিথ্যে স্বধর্মী-বিধর্মী, মুমিন-কাফির প্রভেদ ছিলো না। সকলে সমভাবে তাঁর গৃহে অবস্থান করত। *(সহীহ মুসলিম)*

অনেক সময় অতিথিদেরকে আহার্য প্রদান করে পরিবারবর্গসহ অনাহারে থাকতেন। আবু বাসরা আল-গাফ্ফারী (রাযি.) বলেছেন, 'আমি যখন ইসলামে অবিশ্বাসী ছিলাম তখন একদিন রাসূল (সা.)-এর আতিথ্য গ্রহণ করি। তখন অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিলাম। রাসূল (সা.) আমাকে পরিতৃপ্তভাবে ভোজন করাতে অগ্রসর হয়ে ঘরের সমস্ত দুগ্ধ প্রদান করেছিলেন এবং পরিবারবর্গসহ তিনি অনাহারে ছিলেন।' *(মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল, খ. ৬, পৃ. ৩৯৭)*

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর ব্যবহার এবং ক্রিয়াকলাপে কখনও আত্মম্ভরিতা ও অহমিকার লেশমাত্র প্রকাশ পায়নি। হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেছেন, 'তিনি সবধরনের কাজ স্বহস্তে করতেন। পরিধেয় বস্ত্র ও চামড়ার পাদুকা নিজে সেলাই করতেন, বাজার হতে দ্রব্যাদি ক্রয় করে আনতেন। উটের তত্ত্বাবধান করতেন এবং স্বহস্তে আহার দিতেন, দুগ্ধ দোহন করতেন এবং ভৃত্যের সঙ্গে আটা পিষতেন।' *(সহীহ আল-বুখারী)*

---

[১] (ক) আল-বুখারী, ***আস-সহীহ***, খ. ৮, পৃ. ১৬, হাদীস: ৬০৫০; (খ) মুসলিম, ***আস-সহীহ***, খ. ৩, পৃ. ১২৮৩, হাদীস: ১৬৬১; হযরত আবু যর আল-গিফারী (রাযি.) থেকে বর্ণিত

তাঁর জীবনের প্রতি মুহূর্তে সাম্যবাদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়েছে। একদিন তিনি কতিপয় সহচরসহ সফরে যাচিছলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে সকলে এক নির্জন স্থানে শিবির স্থাপন করে রন্ধনকাজে ব্যাপৃত হলেন এবং নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন কাজ ভাগ করে নিলেন, কিন্তু তারা হযরতকে কোনো দায়িত্বভার অর্পণ করলেন না, তিনি বিস্ময়াপন্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাকে যে কোন কার্যভার দিলেন না?' সকলে বিনীতভাবে উত্তর দিলেন, হুযুর আপনি আল্লাহর রাসূল, জগতের গুরু, নয়নমণি। আপনাকে কোনো কাজ করতে হবে না।' রাসূল (সা.) তাদেরকে বললেন, 'যে ব্যক্তি নিজেকে শ্রেষ্ঠতর মনে করে স্বীয় বন্ধুগণের মধ্যে বসে থাকে আল্লাহ তাকে ভালবাসেন না। আমি কাঠ সংগ্রহের ভার গ্রহণ করলাম।' তিনি তাদের প্রভ্যুত্তরের অপেক্ষায় রইলেন না। নিকটবর্তী জঙ্গল হতে কাঠ সংগ্রহ করে স্বীয় মস্তকে বহন করে নিয়ে আসলেন। *(শরহুয যুরকানী আল মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া বিল মানহিল মুহাম্মাদিয়া, খ. ৪, পৃ. ৩০৬)*

যদিও কিঞ্চিত আহার্য তাঁর ক্ষুন্নিবৃত্তি করতো, কিন্তু তাও তিনি একা আহার করতেন না, উপস্থিত সবাই মিলে মিশে আহার করতেন, আহার্য অভাবে রাসূল (সা.) ও তাঁর পরিবারবর্গ উপর্যপুরি বহু রজনী অনাহারে অতিবাহিত করেছেন। *(সুনানে তিরমিযী)* তাঁরা উপর্যপুরি দু'দিন কখনো পূর্ণভাবে আহার করেননি। *(সহীহ আল-বুখারী)*

নবী করীম (সা.) দানশীলতায় অতুলনীয় ছিলেন। তিনি জগতে দানশীলতার এক মহা আদর্শ রেখে গিয়েছেন। সমগ্র জীবনে তিনি দানপ্রার্থীকে কখনো না বলেননি। রমযান মাসে অত্যধিক দান করতেন। *(সহীহ আল-বুখারী)*

তিনি বলতেন,

«الْفَقْرُ فَخْرِيْ».

'দারিদ্র পীড়িত জীবন আমার গৌরব।'

দান করতে তিনি এতো দূর আত্মহারা হয়ে যেতেন যে, নিজের জন্য কিছু রাখতেও ভুলে যেতেন। এরূপ দেখা গেছে, যেদিন তিনি সহস্র মুদ্রা দান করতেন সেদিন প্রদীপের তেলটুকু কেনার অর্থ তাঁর ঘরে থাকতো না। যেদিন তিনি শতশত দরিদ্রকে অন্ন দান করতেন সে দিন তাঁর পরিবারের জন্য এক গ্রাস আহার্য থাকতো না। তিনি বলেছেন, 'কৃপণতা ও ধর্মপরায়ণতা কখনো এক হৃদয়ে স্থান পেতে পারে না, যে ব্যক্তি প্রতিবেশীকে ক্ষুধার্ত রেখে স্বীয় উদর পূর্ণ করে সে প্রকৃত মুমিন নয়।'

রাসূল (সা.) বিচারে কখনো পক্ষপাতিত্ব করেননি। সর্বদা নিরপেক্ষভাবে বিচার করতেন। মুসলমানদের বিচার কুরআন বিধি মতে এবং খ্রিস্টানদের বিচার বাইবেল বিধি মতে সম্পাদন করতেন। *(সুনানে আবু দাউদ)*

একদিন মাখযুম সম্প্রদায়ের জনৈক নারী চুরির অপরাধে ধরা পড়ে। রাসূল (সা.) উসামা ইবনে যায়েদকে অতি-স্নেহ করতেন। কতিপয় লোক এ নারীর জন্য অনুরোধ করতে ওসামাকে রাসূল (সা.)-এর নিকট প্রেরণ করে। রাসূল (সা.) উসামাকে বললেন, 'তুমি কি আমাকে আল্লাহর আদেশের বিপরীত কার্য করতে অনুরোধ কর?' উসামা নিরুত্তর রইলেন। তারপর সকলকে সম্বোধন করে বললেন, 'পূর্বাকালে বহু সম্প্রদায় ন্যায়ের মানদণ্ড মেপে বিচার কাজ সম্পাদন না করায় বিধ্বস্ত হয়েছে। কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অপরাধ করলে তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করতো না, পক্ষান্তরে সাধারণ ব্যক্তি অপরাধ করলে তাকে কঠোর দণ্ড দণ্ডিত করত। আল্লাহ শপথ মুহাম্মদের কন্যা ফাতেমা চুরি করলেও তার হাত কেটে ফেলা হবে।'[১]

বীরত্বে তিনি জগতের ইতিহাসে অতুলনীয় ছিলেন। তিনি বদর যুদ্ধে সকলের অগ্রে ছিলেন। ওহুদ যুদ্ধে স্বয়ং আহত হয়েছিলেন। কিন্তু রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করেননি। হুনাইনের যুদ্ধে বেশকিছু মুসলিম সেনা পলায়ন করেছিল। কিন্তু তিনি একপদও পশ্চাৎপদ হননি।

পরিশেষে অতটুকু বলা যায় যে, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) হচ্ছেন আমাদের জীবনের উত্তম আদর্শ। তাঁকে আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ভালবাসতে হবে। এটি সেই সময় বাস্তবে পরিণত হবে যখন আমরা তাঁর প্রদর্শিত পথে আমাদের জীবনকে পরিচালিত করবো এবং তাঁর আদর্শ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হবো না।

---

[১] (ক) আল-বুখারী, ***আস-সহীহ***, খ. ৪, পৃ. ১৭৫, হাদীস: ৩৪৭৫; (খ) মুসলিম, ***আস-সহীহ***, খ. ৩, পৃ. ১৩১৫, হাদীস: ১৬৮৮:

عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِيْ سَرَقَتْ، فَقَالُوْا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلَ الله ﷺ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُوْلِ الله ﷺ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ: «أَتَشْفَعُ فِيْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ الله»، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِيْنَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَايْمُ الله لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا».

হযরত মুহাম্মদ (সা.) খুলুকে আযীম

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মহানুভব ব্যক্তিত্বে মানবতার চারিত্রিক সৌন্দর্যের রূপ পূর্ণতার চরম শিখরে পৌঁছেছিল। আমানত, সত্যবাদিতা, বীরত্ব, ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদির এমন কোনটা দিক বাকি রয়েছে যা মহানবী (সা.)-এর পূর্ণাঙ্গতার সাক্ষ্য বহন করছে না? যদি তাঁর চারিত্রিক সৌন্দর্যগুলো বাদ দিয়ে শুধুমাত্র তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির প্রশস্ততা এবং সামগ্রিকতাকে পূর্ণাঙ্গতার মানদন্ডে স্থির করা হয় তাহলেও রাসূল (সা.) মানবতার মূর্তপ্রতীক হিসেবে ভাস্বর হয়ে উঠেন। ইতিহাসে তার নজীর নেই, ব্যক্তিগত এবং সামষ্টিক চারিত্রিক সৌন্দর্যের বিভিন্ন আলোকচ্ছটা পারস্পরিক সম্মিলনের মাধ্যমে রিসালতের আলোর মধ্যে এমনভাবে মিলে-মিশে গেছে যে,পৃথিবী এক অতুলনীয় মহান চরিত্র সম্পর্কে অবগত হয়েছে।

পদার্থ বিদ্যার সুবিখ্যাত মত হচ্ছে, আমাদের চক্ষুর আলোর অনুভূতি ৭টি বিভিন্ন রঙের সংমিশ্রণে হয়ে থাকে। এ ৭টি রঙ স্বতন্ত্রভাবে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কিন্তু প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষের স্বাভাবিক চাহিদা এই যে, আলোকচ্ছটা ৭টি রঙের রূপকে বোঝায় যা সাধারণ পরিভাষায় 'সাদা রঙ' বলে আখ্যায়িত করা হয়। যা ৭টি রঙের সমষ্টি হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং কোনোটির দ্বারা প্রভাবিত নয়। মানুষের আত্মিক ইতিহাসের সাথে সেই প্রাকৃতিক অবস্থার এক অভূতপূর্ব সাদৃশ্য বিদ্যমান। প্রাচীনকাল থেকে নবীগণ নিজেদের উম্মতগণের পথপ্রদর্শন ও সংশোধনের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন এবং সে বিশেষ উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার জন্য দীনের বিশেষ বিশেষ দিকগুলোকে উজ্জ্বল করতে থাকেন।

কেউ কেউ সম্রাট হিসেবে মানব-দানব, পশু-পাখি এমনকি কীট-পতঙ্গ ও মৎস্যের ওপর রাজত্ব করেছেন। কেউ কেউ দরিদ্রতার বেশে অভাব-অনটনে জীবন অতিবাহিত করেছেন এবং বিপদ-আপদের মোকাবিলায়

অসাধারণ ধৈর্যের মাধ্যমে খোদাভীরুদের পথকে পরিষ্কার করেছেন। কেউ কেউ আল্লাহর নির্দেশে জিহাদের ময়দানে সত্যের বাণীকে সমুন্নত করেছেন। কেউ ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে খোদাদ্রোহীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থেকেও সংযম ও সহনশীলতার মাধ্যমে এদেরকে পরাভূত করার শিক্ষা দিয়েছেন। মোদ্দাকথা এ পবিত্র আত্মা নবী-রাসূলগণ সকলেই দীনের সমস্যাবলির সমাধান কোনো না কোনো বিশেষ পদ্ধতিতে করেছেন, কিন্তু বিপরীতমুখী পন্থাসমূহ একই বৃক্ষের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা এবং একই সূর্যের হাজারো আলোকরশ্মির বিকাশমাত্র। এই বিভিন্ন আলোকরশ্মিসমূহ একই কেন্দ্রবিন্দুতে সম্মিলিত হয়ে হেরা পর্বতের গুহা থেকে বিচ্ছুরিত হওয়া মহান স্রষ্টার উদ্দেশ্য ছিল যাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমপর্যায়ে আলোকিত হতে পারে।

একথা বলার কখনো উদ্দেশ্য এই নয় যে, শেষ নবী (সা.)-এর পূর্বে যত নবী এসেছিলেন তাঁদের বাণী স্বজাতি ব্যতীত অন্যদের জন্য বৈধ ছিল না বা কোনো বিশেষ যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর তাঁদের নির্দেশাবলির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। প্রকৃত কথা এই যে, নবীদের অস্বীকার প্রকৃতপক্ষে আংশিক দীন ইসলামেরই অস্বীকার। কেননা দীনের জন্য কুরআন মজীদ যে 'আল-ইসলাম' নামক পরিভাষা ব্যবহার করেছে এর খবর ইতিহাসের চৌদ্দশত শতাব্দীর বহু পূর্ব হতেই বিদ্যমান, তবুও এটি বলা সঠিক যে, পূর্বেকার নবীদের আবির্ভাব সীমাবদ্ধ এলাকায় বিশেষ উদ্দেশ্যাবলির পরিপূর্ণতা বিধানের জন্য হয়েছিল। এ কারণেই তাঁদের জীবন ও বাণী এমন সামগ্রিকতা ও পরিপূর্ণতা সমৃদ্ধ নয়, যা সমগ্র মানবজাতির চারিত্রিক সংশোধন এবং আত্মিক উন্নতির জন্য কোনো পরিপূর্ণ আইন পেশ করবে।

সরওয়ারে কায়েনাত (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে এক নবীর পর অন্য নবীর আগমন প্রয়োজন ছিল। কেননা কোনো একজন নবী এ চিরন্তন দীনকে সামগ্রিক সফলতা ও পরিপূর্ণতা প্রদান করেননি। যুগের আবর্তনে প্রত্যেক নবীর শুধু সেই নিদর্শনাবলিই সংরক্ষণ করা হয়েছে যার তিনি পরিপূর্ণ প্রকাশক ছিলেন এবং যা দ্বারা মানবজাতি উপকৃত হতে পারে। এ কারণেই নবীগণের প্রত্যেকের সম্পর্কে আমরা বিশেষ ঈমানী মর্যাদা পোষণ করি।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর তওহীদী চেতনা এবং সত্য অনুসরণ, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর চারিত্রিক পূত-পবিত্রতা ও আমানত, হযরত মুসা

(আ.)-এর জিহাদী চেতনা, হযরত আইয়ুব (আ.)-এর ধৈর্য ও আত্মসমর্পন, হযরত ঈসার (আ.) ধৈর্য ও প্রেম এ সকল নবীর বিশেষ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মহানবী সাইয়েদুল মুরসলীন (সা.) সম্পর্কে এ রকম সীমাবদ্ধ বৈশিষ্ট্য আরোপ করা যায় না। তাঁর মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর তওহীদ, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর লজ্জা, সঙ্গে সঙ্গে হযরত মুসা (আ.)-এর জিহাদী প্রেরণা, হযরত আইয়ুব (আ.)-এর ধৈর্য এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রজ্ঞা, হযরত সুলাইমান (আ.)-এর শাসনসহ সকল আম্বিয়ায়ে কেরামের গুণাবলির সমাবেশ ঘটেছে।

হযরত মুসা (আ.)-এর বাণী ছিল চোখের বদলে চোখ, পায়ের বদলে পা। পক্ষান্তরে হযরত ঈসা (আ.)-এর শিক্ষা ছিল অন্যায়ের মোকাবেলা করো না, যদি কেউ তোমার ডান গালে চড় মারে তখন বাম গাল এগিয়ে দাও। বাহ্যিক দৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী পার্থক্য হয়তো ত্রুটিপূর্ণ মনে হতে পারে, কিন্তু সুষ্ঠু বিবেকের কাছে এটি স্পষ্ট যে, হযরত মুসা (আ.) ও ঈসা (আ.)-এর পবিত্র সুন্নাত সত্যবাদিতাশূন্য ছিল না। একজনের মধ্যে ছিল আল্লাহর শানে জালালিয়তের বহিঃপ্রকাশ এবং অন্যজনের মধ্যে ছিল শানে জমালিয়তের সন্নিবেশ। এ ভিন্ন-ভিন্ন আল্লাহর শান এখনো পর্যন্ত কোনো ব্যক্তির মধ্যে সমানুপাতে কেন্দ্রিভূত ও বিকশিত হয়নি। আরবের চীরধারী সম্রাট মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তার মধ্যে এ ধরনের আপাত দৃষ্টিতে বিপরিতমুখী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়। এ দীন ও দুনিয়ার সমন্বয়কারীর জীবন-ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে জ্ঞান স্তম্বিত হয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) সম্পর্কে বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযি.) বর্ণনা করেছেন যে,

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِيْ خِدْرِهَا».

'মুহাম্মদ (সা.) কুমারী মেয়েদের চেয়েও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন।'[১]

এও বর্ণিত আছে যে,

'যখন কোনো অপরাধী তাঁর সম্মুখে এসে ক্ষমা ভিক্ষা করতেন তখন ক্ষমাকারীর ঘাড় লজ্জায় ঝুঁকে যেতো এবং নুরানি চেহারায় অধিক লজ্জাবশত রক্তিম আভাধারণ করতো।'

---

[১] (ক) আল-বুখারী, ***আস-সহীহ***, খ. ৪, পৃ. ১৯০, হাদীস: ৩৫৬২; (খ) মুসলিম, ***আস-সহীহ***, খ. ৪, পৃ. ১৮০৯, হাদীস: ২৩২০

এমন সূক্ষ্ম ও বিনয়ী, শান্ত ও নমনীয় চরিত্রের অধিকারী জনগণের নেতা হিসেবে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ এবং এ উচ্চাভিলাষী জীবনের সার্বিক চার্হিদা পূর্ণ করা অলৌকিকতা বৈকি? অত্যধিক লজ্জা, নম্রতা যাঁর জীবনের ভূষণ, তাঁর চরিত্রে জনগণের নেতৃত্বের জন্য প্রধান গুণ বক্তৃতা, আইন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় কঠোরতা ইত্যাদি গুণাবলি উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। কেননা এর জন্য বীরত্ব, দৃঢ়তা ও প্রশাসনিক দক্ষতার বেশি প্রয়োজন। মহানবী (সা.)-এর চরিত্রে এ পরস্পরবিরোধী গুণাবলির অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে। আমরা দেখতে পাই মহানবী (সা.) যখন একজন মহান নেতা ও সমরনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তখন নিজের মহানুভব আত্মার মধ্যে ধৈর্য, বিনয় ও নম্রতার গুণাবলিও বিদ্যমান। যেমন– মক্কা বিজয়ের দিন তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন,

'হে মক্কাবাসী! আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই।'

মহানবী (সা.)-এর বিনয় ও নম্রতা এরূপ ছিল যে, অহমিকা থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। মদীনার জনৈক পাগলী মেয়ে নিজের কোনো কাজে রাসূল (সা.)-কে পথে থামালো। তিনি দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত পথের পাশে বসে তার সাথে কথোপকথন করতে থাকলেন। ছোট বাচ্চারাও মহানবী (সা.)-এর কাছে সানন্দে আসতো। হুযুর (সা.) তাদেরকে কোলে বসাতেন এবং তাদের সঙ্গে খেলতেন। তিনি মক্কা মুকাররামা তশরীফ আনলে বনী আবদে মুত্তালিব গোত্রের বালকেরা সানন্দে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। হুযুর (সা.) অত্যন্ত স্নেহের সাথে তাদের একজনকে উঠিয়ে নিজের সম্মুখে এবং অপরজনকে পেছনে উঠিয়ে নিলেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করলে পৃথিবীর সাধারণ ঘটনাবলির দৃষ্টিতে ধারণা করা যায় যে, মহানবী (সা.) ধৈর্য ও ভালবাসার অতটুকু পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন যাতে মনে হয় তিনি যেন তাঁর মহান গাম্ভীর্য ও প্রতাপ হয়তো বা হারিয়েছেন, কিন্তু এখানেও এ পবিত্র সত্তা পরস্পরবিরোধী পূর্ণাঙ্গ মর্যাদাতে সর্বাঙ্গীন সুন্দররূপে ভূষিত ছিল। মক্কা বিজয়ের দিন একজন লোক হুযুর (সা.)-এর কাছে এসে কিছু আরজ করতে চাইলে মহানবী (সা.)-এর ব্যক্তিত্ব তার মধ্যে কম্পন সৃষ্টি করল। হযরত (সা.) তাকে এভাবেই অভয় দান করলেন,

'ভয় পেয়ো না, আমি কোনো সম্রাট নই, কুরাইশের এক দরিদ্র মায়ের সন্তান, যে শুকনো গোস্ত খেত।'

মহানবী (সা.)-এর মহৎ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে এ রকম বিভিন্ন প্রকার গুণের সমাবেশ ছিল যেগুলো দুনিয়ার দৃষ্টিতে সর্বদা পৃথক পৃথকভাবে দৃষ্ট হয়েছিল। চিন্তা করুন সেই মহান ব্যক্তিত্ব যিনি ছিলেন ধৈর্য ও শৌর্যের মূর্তপ্রতীক। তাঁর মমতা এতো অধিক ছিল যে, যিনি নিজের খাদেমকে তাঁর সমগ্র চাকুরী জীবনে একবারও একথা বলা পছন্দ করেননি যে,

'তুমি এ কাজ কেন করেছ? বা করনি কেন?'[১]

যার মহান চরিত্রে আল্লাহর পথে আহ্বান এ পথপ্রদর্শনের ব্যাপারে অতটা সূক্ষ্ম-অনুভূতি ছিল যে, কোনো ব্যক্তির অগ্রহণযোগ্য ও বিরক্তিকর ব্যবহারে তিনি বিরক্ত না হয়ে শুধু অতুটুকু বলতেন যে, *'ওরা কেমন লোক যারা এ ধরনের কাজ করে।'* যিনি স্বীয় নম্রতার হাতে নিজে সাজাভোগ করতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু অন্যদের তা বলা পছন্দ করতেন না যে, *'তোমার দ্বারা আমার এ ধরনের কষ্ট হচ্ছে।'* যার চক্ষু লজ্জা অতটুকু ছিল যে, মুসাফাহার মধ্যে অপরপক্ষ হাত টেনে না নেওয়া পর্যন্ত নিজের হাত টেনে নিতেন না।

এক সময় তাঁর সামনে যখন কুরাইশ বংশের বড় বড় নেতৃস্থানীয় লোকের নিকট থেকে সুপারিশ এলো যে, কুরাইশী অপরাধিনী বিনতুল আসওয়াদের চুরির সাজা তার বংশমর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখে ক্ষমা করা হোক। তখন মহানবী (সা.) ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন,

«وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا».

'যদি মুহাম্মদ (সা.)-এর মেয়ে ফাতিমা (রাযি.)ও এ ধরনের কাজ করতেন তা হলে নিশ্চয়ই আমি তার ওপর (শাস্তি) তাই করতাম।'[২]

সহীহ আল-বুখারী ও *মুসলিম* শরীফে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন,

«لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا»

---

[১] আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর = আস-সুনান*, খ. ৪, পৃ. ৩৬৮, হাদীস: ২০১৫:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «خَدَمْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَشْرَ سِنِيْنَ فَمَا قَالَ لِيْ: أُفٍّ قَطُّ، وَمَا قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَهُ، وَلَا لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ لِمَ تَرَكْتَهُ».

[২] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৭৫, হাদীস: ৩৪৭৫; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৩, পৃ. ১৩১৫, হাদীস: ১৬৮৮

'হে লোকেরা! যা কিছু আমি জানি যদি তোমরা তা জানাতে তবে তোমাদের হাসি কম এবং কান্না বেশি আসত।'[১]

হযরত জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) বর্ণনা করেছেন,

«مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ ﷺ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلَا رَآنِيْ إِلَّا تَبَسَّمَ فِيْ وَجْهِيْ».

'ইসলাম গ্রহণ করার পর আমি অনেকবার মহনবী (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়েছি, কিন্তু কোন সময় এ রকম হয়নি যে, হুযুর (সা.) আমাকে দেখেছেন অথচ হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল নিয়ে আমার সাথে মিশেননি অর্থাৎ প্রত্যেকবারই আমার সাথে হাস্যোজ্জ্বলভাবে মিশেছেন।'[২]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হারিস (রাযি.) বলেছেন,

«مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ».

'আমি কোনো ব্যক্তিকে নবী করীম (সা.)-এর চেয়ে অধিক সচ্চরিত্রবান এবং সুমেযাজ-সম্পন্ন দেখিনি।'[৩]

আল্লামা কাজী আয়ায (রহ.) লিখিত *কিতাবুশ শিফা*য় উল্লেখ রয়েছে যে, 'শত্রু হোক অথবা কাফির সবার সাথে রাসূল (সা.) হাসিমুখে মিলিত হতেন।'[৪] এটিই সেই আকর্ষণ যার মাধ্যমে বিরোধীরাও তাঁর অনুগত হয়ে যেতো।

মহানবীকে (সা.) তাঁর সাহাবীরা এমন সম্মান করতেন যে, তিনি থুথু ফেললে সবাই তা হতে হতে নিয়ে নিতো। তাঁর অযুর পানি সামনে পড়তে পারত না। তিনি শব্দ করতেই অন্য শব্দ বন্ধ হয়ে যেত। তাঁর ইশারায় অভিজাত, ভদ্র ও সম্মানবোধ সম্পন্ন লোকেরা বাধ্য অনুগত ব্যক্তির ন্যায় তাঁর কাছে দৌড়ে আসতেন। এ ধরনের ব্যক্তির অন্তরে যদি পর-মর্যাদার খেয়াল আসে তবে এটি কোনো আশ্চর্যের ব্যাপার বলে মনে হবে না। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা কি? এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য শুধু একটি মাত্র ঘটনার দিকে দৃষ্টিপাত

---

[১] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৮, পৃ. ১০২, হাদীস: ৬৪৮৬; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৮৩২, হাদীস: ২৩৫৯, হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) থেকে বর্ণিত

[২] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ৬৫, হাদীস: ৩০৩৫; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৯২৫, হাদীস: ২৪৭৫

[৩] (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ২৯, পৃ. ২৪৫, হাদীস: ১৭৭০৪; (খ) আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর = আস-সুনান*, খ. ৫, পৃ. ৬০১, হাদীস: ৩৬৪১

[৪] কাযী আয়ায, *আশ-শিফা বি-তা'রীফি হুকূকিল মুস্তাফা*, দ খ. ১, পৃ. ১২২

করুন: হযরত যায়েদ ইবনে সা'না (রাযি.) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ইহুদি ছিল, তাঁর কাছ থেকে রাসূল (সা.) কিছু ধার নিয়েছিলেন। যদিও ধার পরিশোধের নির্দিষ্ট তারিখ এখনো কিছুদিন অবশিষ্ট ছিল। এ অবস্থায় যায়েদ তাগাদা দিতে এসে রাসূল (সা.)-কে কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা ও গালিগালাজ করল। হুযুর (সা.) চুপ করে শুনতে লাগলেন এবং মুচকি হাসতে লাগলেন। হযরত (সা.)-এর প্রতি এ রকম দুর্ব্যবহারে হযরত ওমর (রাযি.) যায়েদের প্রতি অত্যন্ত রাগান্বিত হলে হুযুর (সা.) তাঁকে থামিয়ে বললেন,

«وَأَنَا وَهُوَ كُنَّا إِلَىٰ غَيْرِ هَذَا مِنْكَ أَحْوَجُ يَا عُمَرُ: تَأْمُرَنِيْ بِحُسْنِ الْقَضَاءِ وَتَأْمُرُهُ بِحُسْنِ التَّقَاضِيْ».

'ওমর! আমি তোমার কাছে এ ধরনের ব্যবহার আশা করিনি, তোমার উচিত ছিল তার সাথে সুন্দর ব্যবহার করা এবং আমাকে ঋণ পরিশোধের তাকিদ করা।'[১]

সরওয়ারে আলম (সা.) যে ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন তিনি নিজেই এর বাস্তব নমুনা। আজ যদি আমরা এ আদর্শে সমাজ গড়তে চাই এবং বর্তমান যুগের দুঃখ-দুর্দশা, অশান্তি ও অস্থিরতা দূরীভূত করতে চাই, তবে আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উত্তম আদর্শের অনুসারী হতে হবে। তাহলে ইন শা আল্লাহ সৃষ্টি জগতের সব কিছুই আমাদের করায়ত্ত হবে। প্রখ্যাত দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবাল (রহ.) কতইনা সুন্দরভাবে বলেছেন,

کی محمدؐ سے وفا تو نے تو ہم ☆ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

'যদি তোমরা মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুগত হও তবে আমি (আল্লাহ) তোমাদের এ পৃথিবীতো কী লাওহ-কলম তোমাদের অনুগত হতে বাধ্য।'

আমরা যদি মহানবীর (সা.) আদর্শকে যথাযথ বাস্তবায়ন করতে চাই তাহলে তাঁর আদর্শের অনুকরণে আমাদের সমাজব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। আমাদের নেতৃবৃন্দকে সেসব গুণ অর্জন করতে হবে যেগুলোর মাধ্যমে তাঁরা ইসলামী সমাজ পরিচালনায় যোগ্য হবেন। কেননা আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে এমন দৃষ্টান্ত দৃষ্টিগোচর হয়নি যে, অনৈসলামিক স্বভাব-চরিত্রে অভ্যস্ত কোনো ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

---

[১] কাযী আয়ায, *আশ-শিফা বি-তা'রীফি হুকূকিল মুস্তাফা*, খ. ১, পৃ. ১০৯

উপসংহারে আমরা অতোটুকু বলতে পারি যে, নবী করীম (সা.)-এর মহান চরিত্র ছিল পবিত্র কুরআনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাযি.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, মহানবী (সা.)-এর চরিত্র কী রকম ছিল? তিনি উত্তরে বলেছিলেন,

«كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ».

'তাঁর চরিত্র ছিল আল কুরআন।'[১]

মানব জাতিকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۝

'হে মানবজাতি! নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে অনুসরণীয় সুন্দরতম আদর্শ রয়েছে।'[২]

অতএব আমাদের উচিত আমরা যেন নিজদের চরিত্র সশোধন করে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য এটাকে নজির হিসেবে পেশ করি। শুধু এভাবেই আমরা দীন ও দুনিয়া উভয় জাহানের সফলতা লাভ করতে পারব এবং সত্যের দুশমনদের ওপর বিজয়ী হতে পারব। নিম্নে মহানবী (সা.)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কয়েকটি নমুনা পেশ করা হলো: সত্যবাদিতা, প্রতিশ্রুতি পালন, শত্রুদের ক্ষমা প্রদর্শন, প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ব্যবহার, দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন, সত্য সাক্ষ্য প্রদান, নম্রতাপূর্ণ বাণী, ন্যায়বিচার, মানুষের প্রতি ভালবাসা; সৃষ্টির প্রতি আসক্তি, বিনয়ী, অতিথি সেবা, পশুর প্রতি দয়া, বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, ছোটদের প্রতি স্নেহ, আমানতদারী ক্ষমা প্রদর্শন, ধৈর্য ও দৃঢ়তা, লজ্জা-শরম, দানশীলতা, ত্যাগ, অল্পেতুষ্টি ইত্যাদিতে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। মহানবী (সা.) শুধু চারিত্রিক সৌন্দর্য্যাবলি শিক্ষা দেননি, সাথে সাথে অসচ্চরিত্র থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন– গর্ব ও অহংকার, গীবত, সম্পদের গুদামজাতকরণ, মিথ্যাবাদিতা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, ওজনে কম দেওয়া ইত্যাদি।

---

[১] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৪২, পৃ. ১৮৩, হাদীস: ২৫৩০২

[২] আল-কুরআন, *সুরা আল-কলম*, ৬৮:৪

নূরুম মিনাল্লাহে ওয়া নূরুম মুবীন

মাহে রবিউল আউয়ালে নবী করীম (সা.)-এর শুভাগমনের মাধ্যমে বিশ্বমানবতা দুটো আলোর সন্ধান লাভ করেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক সুবহানহু ওয়া তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ ফরমায়েছেন,

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ۙ﴿۱۵﴾

'হে মানবজাতি! তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নুর (হযরত মুহাম্মদ সা.) এবং কিতাবে মুবীন (কুরআন) এসেছে।'[১]

উল্লেখ্য যে, দীন হচ্ছে আল্লাহর ওয়াহদানিয়তকে স্বীকার করে তাঁর পছন্দ অনুযায়ী বন্দেগি করা। ইলম হচ্ছে, 'নূর' বা আলো। এর ওপর চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, ঈমানের আলো লাভ না করা পর্যন্ত পবিত্র মক্কার জমিনে বসবাস করে আল্লাহর ঘরের প্রতিবেশী হওয়া সত্ত্বেও কাফির ও মুশরিকগণ মনগড়া ও ইচ্ছামত বন্দেগি করতেন। তাই সে সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) সত্য ও আলোর সন্ধ্যানে হেরা পর্বতের গুহায় গিয়ে নির্জন স্থানে অবস্থান করেছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি মহান রাব্বুল আলামীনের প্রদত্ত নুবুওয়াত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এর মাধ্যমে ছিলেন জিবরাইল (আ.) এবং স্থান ছিল হেরা পর্বতের গুহা। হযরত জিবরাইল (আ.) এসে মহানবী (সা.)-কে যে বাণীটি শুনিয়েছেন তা হচ্ছে, اِقْرَاْ ۚ﴿۱﴾ (অর্থাৎ *পড়ুন*)।[২] এর মাধ্যমে একথা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল যে, আসমানী অহীর মাধ্যমে সর্বপ্রথম পড়া বা ইলমচর্চার কথা আমাদের কাছে এসেছে। তেমনিভাবে নুবুওয়াতের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে হুযুর পুরনূর (সা.)

---

[১] আল-কুরআন, *সুরা আল-মায়িদা*, ৫:১৫

[২] আল-কুরআন, *সুরা আল-আলাক*, ৯৬:১

স্বীয় সমাজ, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর প্রতি সত্য দীনের আহ্বান জানানোর জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে।

উক্ত নুবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে হুযুর (সা.) সর্বপ্রথম মক্কা শরীফের মধ্যে প্রজ্জ্বলিত করলেন ঈমানের আলো। এ ঈমান বা তওহীদের আলোতে যারা আলোকিত হয়েছিল এ রকম নিঃস্বার্থ ও সত্যের সন্ধানী লোকদেরকে ধীরে ধীরে সংঘবদ্ধ করলেন। এভাবে হিজাযের জমিনে ঈমানের মশাল জ্বলে উঠার পর ক্রমশ সেখান থেকে বিদূরিত হয়ে গেল অন্ধকার ও মূর্খতা। যারা আল্লাহর হাবীব (সা.)-এর সান্নিধ্যের সুযোগ লাভ করেছিলেন তাদেরকে দীনী ইলম শিক্ষা দিয়ে তিনি ধন্য করেছেন। এক একজন সাহাবীকে পাঠিয়েছেন দীনে হকের বাহক করে একেক দেশে। তাঁদের সততা, ঈমানদারী, আমানতদারী, সত্যবাদিতা এবং ত্রুটিমুক্ত কাজ-কর্মের মাধ্যমে আরব দেশের বাইরেও দীন ইসলামের প্রসার হয়েছে বিস্তরভাবে। কেননা নবী করীম (সা.) স্বীয় সাহাবাদেরকে দীনী তালীমের সাথে দুনিয়াবী বা পার্থিব তালিমও দিয়েছেন। তাই তারা দীন-দুনিয়াবী উভয় জ্ঞানে জ্ঞানী ছিলেন। এও বলা যেতে পারে যে, পবিত্র কুরআনের ইলমের দ্বারাই তাঁদের অন্তর ভরপুর ছিল। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা গ্রহণের প্রতি স্বয়ং নবী করীম (সা.) উৎসাহিত করে ইরশাদ ফরমায়েছেন,

«خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ».

'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে নিজে পবিত্র কুরআন শিক্ষা গ্রহণ করে এবং অপরকে শিক্ষা প্রদান করে।'[১]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বান্দাদের জন্য প্রয়োজনীয় দীনী ও দুনিয়াবী সব বিষয়ের সমাধান দিয়েছেন। অবশ্য পবিত্র কুরআন বোঝার জন্য প্রথমে নূরে ঈমানের একান্ত প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এজন্য আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমায়েছেন,

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ۙ﴿۱۵﴾

'আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে নূর এবং কিতাবে মুবীন এসেছে।'[২]

---

[১] আল-বুখারী, ***আস-সহীহ***, খ. ৬, পৃ. ১৯২, হাদীস: ৫০২৭, হযরত ওসমান ইবনে আফ্‌ফান (রাযি.) থেকে বর্ণিত

[২] আল-কুরআন, ***সুরা আল-মায়িদা***, ৫:১৫

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা নূরের কথা সর্বপ্রথম উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ নূরে মুহাম্মদী (সা.)-এর আগমনকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াতে ইরশাদ ফরমায়েছেন। কোনো প্রকার আলোর সাহায্য ছাড়া যেমন কিতাব দেখা যায় না ও পড়া যায় না, অনুরূপভাবে কিতাবে মুবীন বোঝার জন্য সর্বপ্রথম নূরে ঈমানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যেসব ব্যক্তির নিকট কিতাবে মুবীন বোঝার ক্ষমতা ও যোগ্যতা থাকবে না তাদেরকে লক্ষ করে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমায়েছেন,

فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

'তোমরা যদি দীন ও কুরআন সম্পর্কে না বুঝে থাক তা হলে আহলে যিক্‌রদের নিকট হতে জেনে নাও।'[১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন, কুরআনের ইলম যাদের রয়েছে তাদের নিকট গিয়ে জেনে নাও। কেননা কুরআনের অপর নাম যিক্‌র। উল্লেখ রয়েছে যে, দীনের গবেষক ও মনীষীরা বলেছেন, যারা সবসময় আল্লাহর যিক্‌র করে এবং সর্বদা যিক্‌র করতে করতে কলব পরিস্কার ও পরিশুদ্ধ হয়েছে তাদেরকে আহলে যিক্‌র বলে। যেমন– বিখ্যাত দার্শনিক ও মনীষী আল্লামা জালাল উদ্দীন রুমী (রাযি.) বলেছেন,

معانی قرآن از قرآن بجو ☆ ورنہ یابی از اہلِ دل بجو

'কুরআনের অর্থ সরাসরি কুরআনের মাধ্যমে বুঝে নাও। (যদি অতটুকু যোগ্যতা না থাকে) তাহলে যারা আহলে দিল তাদের থেকে বুঝে নাও।'

অর্থাৎ যারা আহলে যিক্‌র তারাই আহলে দিল। দার্শনিক আল্লামা ইকবাল কতইনা সুন্দরভাবে বলেছেন,

چوں مسلمان اگر داری نظر ☆ در ضمیر خویش و در قرآن نگر

'হে মুসলমানগণ! যদি তোমার অন্তর্দৃষ্টি থাকে তাহলে তোমার অন্তর দিয়ে পবিত্র কুরআনের দিকে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত কর।'

উল্লিখিত আলোচনরার পরিপ্রেক্ষিত আমাদের কাছে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠল যে,

---

[১] আল-কুরআন, *সুরা আন-নাহল*, ১৬:৪৩

১. নবী করীম (সা.)-এর হেরা পর্বতের গুহায় অবস্থান তাঁর স্বীয় ইচ্ছায় ছিল না, বরং *সহীহ আল-বুখারী* শরীফের রেওয়ায়েত হযরত আয়েশা (রাযি.) বর্ণিত হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, অহীর আরম্ভ প্রথম রুয়ায়ে সালেহার (সুস্বপ্নের) মাধ্যমে হয়েছিল, তা নুবুওয়াতের অংশবিশেষ (কোনো ঈমানদার ব্যক্তির ভালো স্বপ্ন দেখাও নুবুওয়াতের অংশবিশেষ)।

২. নুবুওয়াতের দায়িত্ব বহন করে আল্লাহর বান্দাদের হেদায়ত করার পূর্বে খিলওয়াত বা নির্জন স্থানে নিজে আত্মশুদ্ধি লাভ করে এবং নিজ কলবের সংশোধনের মাধ্যমে আল্লাহর ধ্যান ছাড়া সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র একাগ্র চিত্তে আল্লাহর দিকে রুজু হওয়া। তাই তরীকতের শায়খ বা কোনো কোনো পীর-বুযর্গ সাহেবান অনুরূপভাবে নির্জনে অবস্থান করেছেন এবং বিভিন্ন স্থানে খানকা বা ইবাদতখানা ও মসজিদ ইত্যাদি তৈরি করে আসছেন। এই বলে যারা মসজিদে ও খানাকায় বসে যিক্‌র-আযকার করে থাকেন তাঁদের সমালোচনা করা বা তাঁদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা শরীয়তসম্মত নীতিকে অমান্য করা এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাস্তব সুন্নাতকে অস্বীকার করা।

নবী করীম (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক রয়েছে তা দীনে ইসলামের মধ্যে গণ্য। তাই সকল মুসলমানদের সর্বদিকের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আমরা যদি শুধু তাঁর জীবনের বিশেষ একটা দিক সিয়াসত বা রাজনীতিকে প্রাধান্য দেই এবং ইবাদতের দিক অবহেলা করি তা হলে দীন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। নবী করীম (সা.) সর্বগুণে গুণান্বিত ছিলেন। সারা জগদ্বাসীর জন্য রিসালতের দায়িত্ব নিয়ে মানুষের হেদায়তের জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁকে প্রেরণ করেছেন। কোনো মুমিন বা অলী-বুযুর্গদের জন্য জীবনের সর্বস্তরে নবী করীম (সা.)-এর সম্পূর্ণ অনুকরণ ও অনুসরণ করে চলা সম্ভবপর নয়। এজন্য যে, এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, 'শরীয়ত সবসময় মানুষের ওপর গালিব (প্রধান্য) থাকবে। যেমন– সওমে বেসাল বা রাত-দিন অনাহারে রোযা রাখা। সাহাবয়ে কেরামগণও এতে হুযুর (সা.)-এর অনুকরণ করতে চেয়েছিলেন, তখন হুযুর (সা.) তাঁদেরকে সম্বোধন করে ইরশাদ ফরমালেন,

«أَيُّكُمْ مِثْلِيْ، إِنِّيْ أَبِيْتُ يُطْعِمُنِيْ رَبِّيْ وَيَسْقِيْنِيْ».

'আমার মতো তোমাদের মধ্যে কার সাধ্য আছে যে, সব বিষয়ে আমার অনুকরণ ও অনুসরণ করতে পারবে? স্বয়ং আমার রব আমাকে খাবার ও পানীয় দান করেন।'[১]

তবুও অনেক পীর-বুযর্গ যথা সাধ্য-চেষ্টা করে আসছেন। নূরে মুবীন সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ ফরমায়েছেন,

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ۝

'যদি আমি এ কুরআনকে কোনো পাহাড়ের ওপর অবতীর্ণ করতাম তখন আপনি দেখতে পেতেন যে, আল্লাহ তাআলার ভয়ে পাহাড় ভীত-সন্ত্রস্ত ও টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।'[২]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ۝

'আমি পবিত্র কুরআনের এ আমানত আকাশ, পৃথিবী ও পাহাড়ের ওপর রেখেছিলাম। এরা এটাকে বহন করতে অস্বীকৃতি জানালো এবং ভীত-সন্ত্রস্ত হলো। অতঃপর মানুষ এটি বহন করলো।'[৩]

অর্থাৎ এ নূরে মুবীনের আহকাম বুঝিয়ে দায়িত্ব ও আমানতের গুরুত্ব পালন ও বহন করা যথাযথভাবে সম্ভব হবে না। এ ভয়ে সেই বোঝা বহন করতে তারা অসম্মতি প্রকাশ করলো। উল্লেখ্য যে, পবিত্র হাদীসের ইরশাদ হয়েছে,

«الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ».

'আলিমরা হচ্ছেন নবীদের উত্তরাধিকারী।'[৪]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, নবীর উত্তরাধিকারী হলেন ওলামায়ে কেরাম। কেননা নবীর মিরাস টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ নয়, বরং জাহেরী-বাতেনী ইলম। যেসব ব্যক্তি উভয় ইলমের উত্তরসূরি হবেন তাঁরাই প্রকৃত নায়েবে রাসূল বা রাসূলের প্রতিনিধি হিসেবে দীন ও ইলমের দায়িত্ব

---

[১] আবু আওয়ানা, ***আল-মুসতাখরাজ***, খ. ২, পৃ. ১৮৭, হাদীস: ২৭৯২, হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত

[২] আল-কুরআন, ***সুরা আল-হাশর***, ৫৯:২১

[৩] আল-কুরআন, ***সুরা আল-হাশর***, ৩৩:৭২

[৪] ইবনে মাজাহ, ***আস-সুনান***, খ. ১, পৃ. ৮১, হাদীস: ২২৩, হযরত আবুদ দারদা (রাযি.) থেকে বর্ণিত

পালন করে যাবেন। একথাও আমাদের জেনে রাখা উচিত যে, যে ইলম বা জ্ঞান অহীভিত্তিক নয় তা নিস্ফল। শেখ সা'দী (রহ.) কতইনা সুন্দরভাবে বলেছেন,

علمے کہ رہ بحق نماید، جاہلیست.

'যে ইলমের দ্বারা আল্লাহর পরিচয় বা আল্লাহর পথের সন্ধান পাওয়া যায় না তা প্রকৃত জ্ঞান নয়।'[১]

ইলম ছাড়া ইসলাম পূর্ণ হয় না। উপমা হিসেবে বলা যায় যে, মাছ যেমন পানি ছাড়া থাকতে পারে না তেমনি ইলমবিহীন দীন হতে পারে না। সহীহ ইলমের মাধ্যমে আল্লাহর সহীহ মা'রিফত লাভ করা যায়। বান্দাহর স্বীয় জিন্দেগির বিভিন্ন দিকে দায়িত্ব কি কি রয়েছে? বান্দাহর সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী? এর প্রথম ও শেষ কোথায়? ইত্যাদি জানা ও বোঝার জন্য দীনী ইলমের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই সমাজে বিভিন্ন কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে, দীনী ইলম প্রতিষ্ঠান কায়েম করা। আল্লাহ তাআলা স্বীয় হাবীব (সা.)-কে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে টাকা অর্জন করে এবং ধন-দৌলতের দ্বারা দীনকে জয়ী করার নির্দেশ প্রদান করেননি, বরং সর্বপ্রথমই اِقْرَأْ (অর্থাৎ *পড়ুন*)-এর মাধ্যমে ইলম তলব করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। স্বয়ং নবী করীম (সা.) ইরশাদ ফরমায়েছেন,

«إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا».

'আমি একজন শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।'[২]

অবশ্য এটি জেনে রাখা উচিত, এক প্রকার ইলম স্বয়ং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে লাভ হয়, তাকে 'ইলমে লাদুন্নী' বলা হয়। তা আল্লাহ তাআলা কারো সিনা খুলে দিয়ে দান করে থাকেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَعَلَّمْنَٰهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾

'আমি আমার মনোনীত বান্দাহকে বিশেষ জ্ঞান দান করেছি।'[৩]

---

[১] শায়খ সা'দী, *গযলিয়াতে সা'দী*, পৃ. ৪৭

[২] ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ৮৩, হাদীস: ২২৯, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত

[৩] আল-কুরআন, *সুরা আল-কাহাফ*, ১৮:৬৫

আরও ইরশাদ হয়েছে,

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝

'আমি কি আপনার (নবী করীম সা.) জন্য আপনার বক্ষকে খুলে দিইনি? নিশ্চয়ই খুলে দিয়েছি।'[১]

উভয় আয়াতের দ্বারা উল্লিখিত ইলমের দিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উক্ত ইলমের বাহক হলেন সত্যিকার নায়েবে রাসূল বা পীর-মাশায়েখ। তাঁদের দুআ ও নেক দৃষ্টি আমাদের ওপর পতিত হলে আমরা সত্যিকার মানুষ হতে পারব। তাঁদের নেক দৃষ্টিতে অনেক মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়েছে এবং জাহেল আলেমে পরিণত হয়েছে। অনেক বেদীন দীন লাভ করেছে এবং ঈমানের আলো প্রাপ্ত হয়ে ইসলামী জীবন যাপন করেছে। অনেক পথভ্রষ্ট সহী পথে চলে এসেছে। তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে নায়েবে রাসূলের দায়িত্ব পালন করেছেন যারা ভক্তি ও মহব্বত-সহকারে নায়েবে রাসূলদের সান্নিধ্য লাভ করবেন তাঁরাই বাস্তবরূপে বুঝতে সক্ষম হবেন। যাঁরা ঈমানী ও রূহানী দৌলত লাভে লাভবান হয়েছে তাঁরা তা দৃঢ় বিশ্বাস করে বলেছেন, আল্লাহর মা'রিফত ও মুহাব্বত যদি লাভ করতে ইচ্ছুক ও আকঙ্ক্ষিত হও তা হলে আল্লাহর অলীদের নৈকট্য লাভ করার মাধ্যমে ধন্য হও। কেননা উক্ত নেয়ামত রাজা-বাদশাহদের দরবারে লাভ করা যায় না। *(আল্লামা ইকবাল)*

ভেবে দেখা উচিত যে, যে যতই বড় হোক না কেন তাঁরাও দীনী ইলমের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতে বাধ্য। কারণ শরীয়তের মাসআলা-মাসায়েল ও দীনের আহকাম ইলম শিক্ষার মাধ্যমেই অবগত হওয়া যায়। বে-ইলমের ইবাদত-বন্দেগি ও দীনী খেদমতের মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। তাই দুনিয়ার রাষ্ট্রীয় রীতি-নীতি, তাহযীব ও তামাদ্দুন বিভিন্ন যুগে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু ইলম বা পবিত্র কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা সর্বদা চালু রয়েছে।

অতএব যারা নবী করীম (সা.)-এর অনুসরণ ও অনুকরণে জাহেরী ও বাতেনী উভয় ইলমের দ্বারা আত্মশুদ্ধি লাভে ধন্য হয়েছেন এবং বিভিন্ন নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছেন তাঁদের জবান আল্লাহর জবানে, তাঁদের দৃষ্টি আল্লাহর দৃষ্টিতে, তাঁদের হাত আল্লাহর কুদরতের হাতে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ তাঁদের সমুদয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে খোদায়ী

---

[১] আল-কুরআন, *সুরা আল-ইনশিরাহ*, ৯৪:১

শক্তি চলে এসেছে। *সহীহ আল-বুখারী* শরীফে উল্লিখিত রেওয়ায়েতটি এসেছে। অন্য হাদীসে তাঁদেরকে হুকামাদের মধ্যে গণ্য করেছেন। তাঁদের কথা শুনলে মৃত কলব জিন্দা হয়। ঈমানের নির্বাপিত আলো পুনরায় প্রজ্জ্বলিত হয়। তাই এ সকল চিন্তাবিদ, মনীষী বা ওলামা ও মাশায়েখের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন বোঝা ও আমল করার চেষ্টা করা সকল মুসলমানেরই ঈমানী দায়িত্ব। তাঁরাই নুবুওয়াতের জামানার পর কিয়ামত পর্যন্ত নবী (সা.)-এর উত্তরসূরি হিসেবে কুরআন ও দীনের হেফাজতের দায়িত্ব বহন করে থাকবেন। মহানবী (সা.) হাদীসের মাধ্যমে আমাদেরকে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন যে, কিয়ামত পর্যন্ত নূরে মুবীন বা পবিত্র কুরআন হেফাজতের দায়িত্ব ওলামায়ে কেরামরা পালন করে যাবেন।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, আল্লাহপাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের জন্য দুটি বিশেষ নিয়ামত পাঠিয়েছেন। একটি হচ্ছে 'নুরুম মিনাল্লাহ' অর্থাৎ নূরে মুহাম্মদী (সা.), দ্বিতীয়টা হচ্ছে 'নূরুম মুবীন' অর্থাৎ পবিত্র কুরআন। যারা নূরে মুহাম্মদ (সা.)-এর সম্পর্কের মাধ্যমে 'নূরে ঈমান' বা ঈমানের আলো লাভ করেছেন তাঁরা নূরে মুবীনের জ্ঞান লাভ করে হেদায়তপ্রাপ্ত হয়েছেন। একটা অপরটার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। এটি অজানা নয় যে, যেকোনো ব্যক্তিকে লেখা-পড়া করতে হলে তাকে সূর্যের আলোর সাহায্য নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। আর রাতে দেখার জন্য বাতির আলোর প্রয়োজন। তাই ইসলামী চিন্তাবিদ ও মনীষীগণ বলেছেন, পবিত্র কুরআন পড়ে ও বুঝে হেদায়ত লাভ করার জন্য মহানবী (সা.)-এর সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। কেননা তিনি হচ্ছেন হেদায়তের সূর্যস্বরূপ। নায়েবে রাসূলরা হলেন হেদায়তের মশালস্বরূপ। নবী করীম (সা.) পবিত্র হাদীস ইরশাদ করেছেন,

«عُلَمَاءُ أُمَّتِيْ كَأَنْبِيَاءِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ».

'আমার উম্মতের আলেমরা মর্যাদার দিক দিয়ে বনী ইসরাইলদের নবীদের মতোই।'[১]

বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবীদের পরে ওলামায়ে উম্মত নবী (সা.)-এর উক্ত দায়িত্ব পালন করবেন। কেউ যদি প্রশ্ন করে কুরআন

---

[১] আল-আজলূনী, ***কাশফুল খিফা ওয়া মুযীলুল ইলবাস আম্ম ইশতাহারা মিনাল আহাদীস আলা আলসিনাতিন নাস***, খ. ২, পৃ. ৭৪, ক্র. ১৭৪৪

পড়া ও বোঝার জন্য আমার যথেষ্ট বিদ্যা-বুদ্ধি রয়েছে। আবার নূরে মুহাম্মদী (সা.)-এর সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা কেন? উত্তরে আমরা বলব,

১. আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ۙ-এ নূরে মুহাম্মদী (সা.)-কে প্রথমে উল্লেখ করেছেন। এরপর উল্লেখ করেছেন কিতাবে মুবীনের কথা। এর মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন বোঝার পূর্বে নূরে মুহাম্মদী (সা.)-এর সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে ঈমানের আলো লাভ করা একান্ত প্রয়োজন।

২. উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি যে, লেখাপড়া করে উপকৃত হওয়ার জন্য যেমন প্রথমে দৃষ্টিশক্তি থাকা প্রয়োজন। চক্ষু-দৃষ্টির আলো থাকা সত্ত্বেও তার সূর্যের আলো অথবা কোনো বাতির আলোর সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে। অনুরূপভাবে বিদ্যা-বুদ্ধির জ্ঞানের আলো থাকা সত্ত্বেও নবী করীম (সা.)-এর পরে অলীদের ঈমানী ও রূহানী সম্পর্ক অত্যন্ত জরুরি। এ কারণে আল্লহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানবজাতির দীনী ও দুনিয়ারী সকল সমস্যার সমাধানের জন্য প্রেরণ করেছেন 'নূরুম মিনাল্লাহ (হযরত মুহাম্মদ সা.) ও 'নূরে মুবীন' (পবিত্র কুরআন)। আল্লাহ আমাদের সবাইকে নূরুম মিনাল্লাহর সকল আদর্শ মেনে চলার ও নূরে মুবীনের যাবতীয় বিধি-বিধান আমল করার তওফীক দান করুন। আমীন।

মানবতার উসওয়ায়ে হাসানা

বিশ্ব ইতিহাসের বিস্ময় মানবতার পরিপূর্ণ আদর্শ আমাদের প্রাণপ্রিয় নবী আকায়ে নামদার তাজেদারে মদীনা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন আমাদের জন্য উসওয়ায়ে হাসানা। আল্লাহ তাআলা তাঁকে মানবতার নবী করে মানবজীবনের পরিপূর্ণ আদর্শরূপে প্রেরণ করেছেন। তাঁর জীবনধারা সমগ্র সৃষ্টির জন্য রহমতস্বরূপ। মহান আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁকে শুধু রাহমাতুললীল মুসলিমীন বলে ঘোষণা দেননি, বরং রাহমাতুললিল আলামীন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এখন আমরা এ মহান সাইয়িদুল আম্বিয়ার কিছু কিছু উসওয়ায়ে হাসানা সকলের আমলের জন্য পেশ করছি,

উত্তম স্বভাব

হযরত আলী (রাযি.), হযরত আয়েশা (রাযি.) ও হযরত আনাস (রাযি.) প্রমুখ প্রখ্যাত সাহাবীগণ যাঁরা দীর্ঘকাল রাসূল (সা.)-এর খেদমতে ছিলেন তাঁদের সকলের সর্বসম্মত বর্ণনা হচ্ছে, তিনি নম্র স্বভাব, উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁর মুখমণ্ডল সবসময় হাস্যোজ্জ্বল ছিল এবং কথাবার্তা ছিল গুরুগম্ভীর। কারও মনে কষ্ট পায় এমন কথা তিনি কোনো দিন বলতেন না। কারও সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলে তিনি সর্বপ্রথম তাঁকে সালাম দিতেন ও করমর্দন করতেন। যদি কোনো ব্যক্তি তাঁর কানের কাছে ঝুঁকে কথা বলতেন তবে যতক্ষণ সে তার মুখ সরিয়ে না নিত ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাঁর দিক হতে মুখ সরিয়ে নিতেন না। করমর্দনের বেলায়ও এ নিয়ম ছিল। যদি কারও সাথে তিনি হাত মিলাতেন যতক্ষণ না সে হাত ছাড়িয়ে না নিত ততক্ষণ তিনি হাত ছাড়িয়ে দিতেন না। মজলিসে বসা অবস্থায় তাঁর হাঁটু কখনো অন্যান্যদের সম্মুখে প্রসারিত থাকতো না। *(সুনানে আবু দাউদ ও তিরমিযী শরীফ)*

কারও কোনো আচরণ অপছন্দ হলেও মুখের ওপর তাকে লজ্জা দিতেন না, অন্যের দ্বারা সাবধান করিয়ে দিতেন। একদিন এক ব্যক্তি আরবের প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী জাফরান মেখে দরবারে হাজির হলেন। হুযুর (সা.)-এর কাছে তা অপছন্দ হলেও তার সম্মুখে কিছু বলেননি, বরং লোকটি উঠে যাওয়ার পর অন্য একজনকে ডেকে বললেন,

'তাকে এ রঙ ধুয়ে ফেলতে বলিও।' *(সুনানে আবু দাউদ)*

অপর দিকে আমরা দেখতে পাই, হযরত আয়েশা (রাযি.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা.)-এর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলো। হুযুর (সা.) সাহাবীদেরকে বললেন, 'তাকে আসার অনুমতি দাও, সে স্বীয় গোত্রের খারাপ ব্যক্তি।' যখন লোকটি হুযুরের দরবারে এসে বসলো, তখন নবী করীম (সা.) হাস্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে তার দিকে তাকালেন এবং মৃদুহাস্যে তার সাথে কথা বললেন। যখন লোকটি চলে গেল হযরত আয়েশা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! আপনি লোকটি সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করেছেন। অতঃপর আপনিই তার সাথে প্রাণ খুলে সাক্ষাৎ করলেন এবং মৃদুহাস্যে কথা বললেন। একথা শুনে রাসূল (সা.) ইরশাদ করলেন, 'তুমি আমাকে কখনও অশ্লীলভাষী পেয়েছ? (কখনো নয়)। কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সে ব্যক্তি মর্যাদার দিক দিয়ে নিকৃষ্ট, যাকে মানুষ তার অনিষ্টের ভয়ে ত্যাগ করবে।' *(সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম শরীফ)*

লেনদেনে সততা

অপরের দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে গিয়ে হুযুর (সা.) ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়তেন। এমনকি ওফাতের সময় পর্যন্ত একটি বর্ম জনৈক ইহুদির নিকট এক মণ গমের বদলায় বন্ধক রাখা ছিল। কিন্তু সর্বাবস্থাতেই লেনদেনের ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধান থাকতেন। সর্বোতভাবে সততা বজায় রাখাতেন।

নুবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেও যেসব লোকের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল তারা সকলেই তাঁর সততা এবং স্বচ্ছ লেনদেনের ভূয়সী প্রশংসা করতেন। এমনকি কুরাইশরা এক বাক্যে তাঁকে আল-আমীন উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। হুযুর (সা.) নুবুওয়াতপ্রাপ্তির পর কুরাইশরা যদিও বিদ্বেষ-বিষে জর্জরিত হয়ে গিয়েছিলো। তা সত্ত্বেও ধন-সম্পদ আমানত রাখার জন্য সর্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থান হুযুর (সা.)-এর ঘরকে তারা মনে করতো।

আরবে সায়েব নামে একজন ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। মুসলমান হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরামগণ তাকে হুযুর (সা.)-এর খেদমত এনে হাজির করলেন এবং অনেক প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করে হুযুর (সা.)-এর কাছে তার পরিচয় পেশ করলেন। হুযুর (সা.) ইরশাদ করলেন, 'তাকে আমি তোমাদের সকলের চেয়ে ভালো জানি।' সায়েব তখন করজোড়ে নিবদেন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! আপনি একসময় আমার সাথে ব্যবসা করতেন। আমার পিতা-মাতা আপনার ওপর কুরবান হোক, আপনার সততা ও আচার-ব্যবহার হচ্ছে অতুলনীয়।[১]

সত্যবাদিতা

সত্যবাদিতা নবী-রাসূলগণের একটি আকর্ষণীয় গুণ। বিশেষ করে হুযুর পুরনূর (সা.)-এর সত্যবাদিতার স্বীকারোক্তি শত্রু তথা কাফিরদের পক্ষ হতেও যতটুকু আমরা জানতে পেরেছি এর কয়েকটি নিম্নে উপস্থাপন করছি,

কুরাইশ নেতা আবু জাহেল বলত, মুহাম্মদ (সা.)! আমি তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি না। তবে তুমি যা বল তা ঠিক নয়। *(তিরমিযী শরীফ)*

এ প্রসঙ্গে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়:

قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِيْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿٣٣﴾

'হে আমার প্রিয় হাবীব! আমি জানি কাফিরদের এ অবান্তর কথা আপনাকে চিন্তিত করে তোলে। কেননা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে না, কিন্তু জালেমরা আল্লাহর আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে থাকে।'[২]

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মানুষের মধ্যে নুবুওয়াত সম্পর্কে ঘোষণা প্রদান করার নির্দেশপ্রাপ্ত হওয়ার পর যখন হুযুর (সা.) মক্কাবাসীদেরকে সাফা পাহাড়ের পাদদেশে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি

---

[১] আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ৪, পৃ. ২৬০, হাদীস: ৪৮৩৬:

عَنِ السَّائِبِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَجَعَلُوْا يُثْنُوْنَ عَلَيَّ وَيَذْكُرُوْنِيْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «أَنَا أَعْلَمُكُمْ» يَعْنِيْ بِهِ، قُلْتُ: صَدَقْتَ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ: كُنْتَ شَرِيْكِيْ فَنِعْمَ الشَّرِيْكُ، كُنْتَ لَا تُدَارِيْ، وَلَا تُمَارِيْ.

[২] আল-কুরআন, *সুরা আল-আনআম*, ৬:৩৩

যদি বলি, পাহাড়ের অপর পাশে একটি শত্রুদল তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য ওঁৎপেতে রয়েছে, তবে কি তোমরা তা বিশ্বাস করবে? জবাবে তখন সকলেই সমস্বরে বলেছিল, আমরা তো কোনো দিন আপনাকে মিথ্যা বলতে দেখিনি।' *(সহীহ আল-বুখারী শরীফ)*

রোম সম্রাটের দরবারে আবু সুফিয়ানকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, নুবুওয়াত দাবি করার পূর্বে কখনো কী তোমরা তাঁকে মিথ্যা বলতে শুনেছ? উত্তরে তিনি বললেন, না কখনো না। অতঃপর সম্রাট তাঁর মন্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছিলেন, তোমরাই তো বলছ জীবনে তিনি কোনো দিন মিথ্যা কথা বলেননি। তাহলে আজ কেন তাঁর সম্পর্কে তোমাদের এ মন্তব্য?[১]

ওয়াদা পালন

ওয়াদা পালন হুযুর (সা.)-এর পবিত্র আখলাকের এমন একটি ভূষণ ছিল যে, শত্রুগণও তা নির্দ্বিধায় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। রোম সম্রাটের দরবারে আবু সুফিয়ানকে অন্যান্য প্রশ্নের সাথে এ প্রশ্ন করেছিলেন যে, কখনো কি মুহাম্মদ (সা.) ওয়াদা ভঙ্গ করেছেন? এ প্রশ্নের জবাবে আবু সুফিয়ান সুস্পষ্টভাবে বললেন, না, কোন দিন এরূপ শুনিনি।[২]

হুদায়বিয়ার সন্ধির অন্যতম শর্ত ছিল মক্কা হতে যদি কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় চলে যায়, তবে মক্কাবাসীরা দাবি করলে তাকে মদীনাবাসী ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে। সন্ধির শর্তাদি লিপিবদ্ধ হওয়ার সময় আবু জান্দাল পায়ে শিকলপরা অবস্থায় মক্কাবাসীদের বন্দীশালা হতে পলায়ন করে মদীনায় আশ্রয় গ্রহণ করলো। মুসলিম শিবিরের সকলেই এ লোমহর্ষক নির্যাতনের জন্য বিচলিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু হুযুর (সা.) তাঁকে সম্বোধন করে অবিচল কণ্ঠে শুধু উচ্চারণ করলেন, 'আবু জান্দাল! আমি ওয়াদা ভঙ্গ করতে পারি না। আল্লাহ তাআলা খুব শীঘ্রই তোমার জন্য কোনো রাস্তা বের করে দেবেন।'[৩]

---

[১] আল-বুখারী, ***আস-সহীহ***, খ. ১, পৃ. ৮–১০, হাদীস: ৭, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত

[২] আল-বুখারী, ***আস-সহীহ***, খ. ১, পৃ. ৮–১০, হাদীস: ৭, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত

[৩] আল-বুখারী, ***আস-সহীহ***, খ. ৩, পৃ. ১৮৫, হাদীস: ২৭০০, হযরত আযিব ইবনে বারা (রাযি.) থেকে বর্ণিত

নুবুওয়াত পূর্বযুগের ঘটনা, আবদুল্লাহ ইবনে আবু আসমা নামক এক ব্যক্তি ব্যবসায়িক লেনদেন উপলক্ষে হুযুর (সা.)-কে এক জায়গায় অপেক্ষা করতে বলে ফিরে আসতে ভুলে গেল। ৩ দিন পর সে ফিরে এসে দেখতে পেল, হুযুর (সা.) ওয়াদা রক্ষার খাতিরে সেখানে বসে রয়েছেন। হুযুর (সা.) তাকে দেখে ফরমালেন, '৩ দিন যাবৎ আমি আমার কথা রক্ষার জন্য এখানে বসে অপেক্ষা করছি।' *(সুনানে আবু দাউদ)*

ধৈর্য ও ক্ষমা

সীরাতের সকল লিখক এবং বর্ণনাকারীগণ দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করেছেন যে, হুযুর (সা.)-এর জীবনে কখনো তিনি কারও ওপর প্রতিশোধ গ্রহন করেননি। *সহীহ আল-বুখারী* ও *মুসলিম* শরীফে হযরত আয়েশা (রাযি.) হতে বর্ণিত যে, হুযুর (সা.)-এর জীবনে কোনো দিন ব্যক্তিগত কারণেও কারও থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। একমাত্র দীনের ব্যাপারে কেউ সীমালঙ্ঘন করলে তাকে প্রতিশোধের সম্মুখীন হতে হত।

ইসলাম প্রচারের প্রাক্কালে কুরাইশরা প্রিয়নবী (সা.)-কে অশ্লীল গালি দিয়েছে, হত্যা করার চেষ্টা করেছে, পবিত্র বদনে ময়লা নিক্ষেপ করেছে, গলায় ফাঁস লাগিয়ে কষ্ট দিয়েছে, পথে-পথে নানাভাবে অপদস্থ করার চেষ্টা করেছে। কখনো যাদুকর, কখনো পাগল বা মুর্খ কবি বলে হাসি ঠাট্টা করেছে, কিন্তু কোনো সময় হুযুর (সা.) এদের প্রতি রাগান্বিত হননি। যায়েদ ইবনে সা'না (রাযি.) ইহুদি থাকা অবস্থায়ী অর্থলগ্নীর ব্যবসা করতেন। একবার হুযুর (সা.) তার নিকট হতে কিছু ঋণ গ্রহণ করেছিলেন। মেয়াদের সময়সীমা কিছুটা অবশিষ্ট থাকতেই তাগাদা করতে আসলেন। পবিত্র চাদর টেনে ধুর নানারূপ কটূ কথা শোনাতে শোনাতে বলে ফেললেন, আবদুল মুত্তালেবের গোষ্ঠীরা, তোমরা সবসময় এ রকম করে থাক। হযরত ওমর (রাযি.) নিজকে সামলাতে পারলেন না। রাগে অগ্নীশর্মা হয়ে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহর দুশমন! তুই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে দৃষ্টতা দেখাচ্ছিস। হুযুর (সা.) তখন মুচকি হেসে বলতে লাগলেন, ওমর! তোমার নিকট হতে আমি অন্য কিছু আশা করেছিলাম, তাকে বুঝিয়ে দেয়া উচিত ছিল, যেন নম্র-ভদ্রভাবে তাগাদা করে এবং আমাকে বলা উচিত ছিল যেন আমি যথাসম্ভব শীঘ্র তার ঋণ পরিশোধ করে দেই। একথা বলে হযরত উমর (রাযি.)-এ প্রতি ইশারা করে নির্দেশ দিলেন,

«إِنَّا كُنَّا أَحْوَجَ إِلَىٰ غَيْرِ هَذَا مِنْكَ يَا عُمَرُ، أَنْ تَأْمُرَنِيْ بِحُسْنِ الْأَدَاءِ، وَتَأْمُرَهُ بِحُسْنِ التِّبَاعَةِ، اذْهَبْ بِهِ يَا عُمَرُ فَاقْضِهِ حَقَّهُ، وَزِدْهُ عِشْرِيْنَ صَاعًا مِنْ غَيْرِهِ مَكَانَ مَا رُعْتَهُ».

'এখনই তার ঋণ পরিশোধ করে দাও এবং ২০ স' খেজুর আরও অতিরিক্ত দিয়ে দাও।'[১]

হুনাইনের যুদ্ধে গনীমত বিতরণ করার পর জনৈক আনসার মন্তব্য করে বলল, এ বণ্টন আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের প্রতি লক্ষ্য রেখে করা হয়নি। একথা হুযুর (সা.)-এর কানে গেলে শুধু অতটুকু মন্তব্য করলেন যে,

'আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা (আ.)-এর প্রতি রহমত করুন তাকে লোকেরা এর চেয়েও অধিক কষ্ট দিয়েছে, কিন্তু সে সবই তিনি সহ্য করেছেন।'

হযরত আনাস (রাযি.) নিজেই বর্ণনা করেছেন, আমার বাল্যকালের ঘটনা। একদিন হুযুর (সা.) আমাকে ডেকে কোনো একটি কাজে যেতে বললেন। বালকসুলভ চপলতার কারণে আমি বলে ফেললাম, এখন যেতে পারব না। এ বলে আমি বাইরে গিয়ে খেলা করতে শুরু করলাম। কিছুক্ষণ পর হুযুর (সা.) পিছন দিক হতে এসে আমার ঘাড়ে হাত রাখলেন। ফিরে দেখলাম, তিনি হাসছেন, বললেন, 'যেতে পারবে তো?' এবার আমি বিনাদ্বিধায় সম্মত হয়ে কাজে চলে গেলাম।

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «وَاللهِ لَقَدْ خَدَمْتُهُ سَبْعَ سِنِيْنَ، أَوْ تِسْعَ سِنِيْنَ، مَا عَلِمْتُ قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُ: لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا، وَلَا لِشَيْءٍ تَرَكْتُ: هَلَّا فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا».

'হযরত আনাস (রাযি.) আরও বলেন, বাল্যকালে আমি দীর্ঘ ৭ বছর হুযুর (সা.)-এর খেদমত করেছি। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে একদিন ও তিনি আমাকে শাসননি বা একথা বলেননি যে, 'অমুক কাজটি কেন করলে বা এরূপ করলে না কেন?''[২]

---

[১] (ক) ইবনে হিব্বান, *আস-সহীহ = আল-ইহসান ফী তকরীবি সহীহ ইবনি হিব্বান*, খ. ১, পৃ. ৫২১–৫২৫, হাদীস: ২৮৮; (খ) আল-বায়হাকী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত*, খ. ৬, পৃ. ২৭৮–২৮০, হাদীস: ২৫৩৮, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সাল্লাম (রাযি.) থেকে বর্ণিত

[২] (ক) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৮০৪, হাদীস: ২৩০৯; (খ) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ৪, পৃ. ২৪৭, হাদীস: ৪৭৭৩

ইসার বা ত্যাগ

হুযুর (সা.)-এর চরিত্রে যে গুণটি সর্বক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা অধিকমাত্রায় ফুটে উঠেছিল তা হচ্ছে তাঁর অসাধারণ ইসার বা ত্যাগ-তিতীক্ষা। সন্তানদের প্রতি তাঁর মমতা ছিল সীমাহীন। তাঁদের মধ্যে হযরত ফাতিমা (রাযি.)-এর স্থান ছিল সর্বোচ্চ। হযরত ফাতিমা (রাযি.) এমন কঠিন দারিদ্যের মধ্যে জীবন যাপন করতেন যে তাঁর ঘরে কোনো চাকরানি ছিল না। তিনি নিজেই আটার চাকতি মশক ভরে পানি বহন করে আনতেন, চাকতি পিষতে পিষতে দু'হাতে কড়া পড়ে গিয়েছিল। মশক উঠাতে উঠাতে বক্ষে নীল দাগ পড়ে গিয়েছিল। একদিন পিতার খেদমতে এসে একটি কাজের লোক পেতে প্রার্থনা করতে মনস্থ করলেন। কিন্তু লজ্জা-সংকোচ কাটিয়ে সেকথা তিনি পেশ করতে পারলেন না। হযরত আলী (রাযি.) কথাটা তুললেন। মাত্র কয়েক দিন পূর্বে কোনো একটি যুদ্ধলব্ধ সম্পদের সাথে কয়েকটি দাসীও পাওয়া গিয়েছিল তার মধ্য থেকে একটি দাসীর জন্য আবেদন করলেন। হুযুর (সা.)-এর জবাবে ইরশাদ করলেন,

> *'দেখ এখনো আসহাবে সুফ্ফার ছিন্নমূল লোকদের পুনর্বাসনের কোনো ব্যবস্থা হয়নি। যে পর্যন্ত তাঁদের কোনো ব্যবস্থা করা যাবে না সে পর্যন্ত তোমাদের জন্য আমি কিছু করতে পারব না।'* *(সুনানে আবু দাউদ শরীফ)*

জনৈক সাহাবী ওয়ালীমার খানার জন্য হুযুর (সা.)-এর নিকট কিছু সাহায্যের জন্য আসলেন। হুযুর (সা.) তাকে বলেছিলেন, 'আয়েশার ঘরে এক টুকরী আটা আছে তা চেয়ে নাও।' সাহাবী কথামতো আটা নিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু খোদ হুযুর (সা.)-এর ঘরে এ আটাটুক ছাড়া খাবার আর কিছু ছিল না। *(মসনদে আহমদ)*

এক রাতে গিফার গোত্রের এক ব্যক্তি হুযুর (সা.)-এর ঘরে মেহমান হলেন। ঘরে সামন্য বকরীর দুধ ছিল। হুযুর (সা.) তা এনে মেহমানকে খাওয়ালেন আর সে রাতে পরিবারের সকলে উপবাসে রাত যাপন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, আগের রাতেও ঘরের সকলেই উপবাস ছিলেন।

মেহমানদারি

হযরত (সা.) মেহমানদারির ক্ষেত্রে মুসলমান কাফির ও মুশরিকের মধ্যে কোনো প্রকার তারতম্য করতেন না। অনেক অমুসলমান এসেও

নিঃসংকোচে মেহমান হতো। হুযুর (সা.) সকলকে সহজভাবে গ্রহণ করতেন এবং আন্তরিকভাবে আপ্যায়ন করাতেন। হাবশীর প্রতিনিধি দলকে নিজের কাছে রেখে হুযুর (সা.) অত্যন্ত উদার চিত্তে তাদের সেবা করেছিলেন। (*আশ-শিফা বি-তা'রীফি হুকূকিল মুস্তাফা*)

আসহাবে সুফফার অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) তাঁর সেই কৃচ্ছতার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বর্ণনা করেন, একদিন আমি ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে রাস্তার এক পাশে বসে পড়লাম। হযরত আবু বকর (রাযি.) রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, আমার অবস্থা পরোক্ষভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আমি তার নিকট পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু তিনি আমার অবস্থা বুঝতে পারলেন না। সোজা চলে গেলেন। অতঃপর হযরত ওমর (রাযি.)-কে দেখতে পেলাম তাঁর সঙ্গেও ঠিক এ ব্যাপার হলো। এরপর রাসূল (সা.)-কে আসতে দেখলাম। তিনি আমাকে দেখে মুচকি হেসে বললেন, 'আমার সঙ্গে আস।' হুযুর (সা.) বাড়ি এসে দুধ ভর্তি একটি পাত্র দেখতে পেলেন। সেটি হাদিয়াস্বরূপ তাঁর কাছে পাঠানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে নির্দেশ দিলেন, 'আসহাবে সুফফার সকলকে আমার কাছে ডেকে আন।' সকলে সমবেত হলে তিনি দুধের পাত্রটি আমার হাতে দিয়ে ইরশাদ করলেন, 'সকলের মধ্যে বণ্টন করে দাও।'[১]

পরিশেষে বলা যায় যে, রেসালতে মাআব (সা.) বিশ্বমানবতার জন্য যেসব উসওয়ায়ে হাসানা রেখে গিয়েছেন তা যদি আমরা আমাদের আমলী জিন্দেগিতে বাস্তবায়ন করি তা হলে আমরা আল্লাহ ও রাসূলের রেযামন্দি হাসেল করতে পারব। পবিত্র কালামে এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক ইরশাদ ফরমায়েছেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ ﴿٣١﴾

'হে আমার প্রিয় হাবীব! আপনি মানবকুলকে বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহর ভালবাসা পেতে চাও তা হলে আমর অনুসরণ কর।'[২]

---

[১] আত-তিরমিযী, ***আল-জামি'উল কবীর = আস-সুনান***, খ. ৪, পৃ. ৬৪৮–৬৪৯, হাদীস: ২৪৭৭

[২] আল-কুরআন, ***সুরা আলে ইমরান***, ৩:৩১

হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইহসানে আযীম

মানবতার করুণ আর্তনাদে আকাশ-বাতাস ধূমায়িত, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র বিক্ষোভ, অশান্তি, ক্ষুধা-অনাহার, জুলুম-নির্যাতন, অন্যায়-অবিচার, বিদ্বেষ, হিংসার নারকীয় বীভৎসতা মানুষকে তিলে তিলে গ্রাস করে ফেলেছিল। মতবাদের সংঘাত, স্বার্থের দ্বন্দ্ব, সশস্ত্র সংঘর্ষের রূপ নিয়ে সৃষ্টির সেরা মানুষের রক্তে পৃথিবী হয়েছিল রঞ্জিত। নিজের চিন্তায় মানুষ নিজেই ছিল আচ্ছন্ন। শত বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, চিন্তা-গবেষণা, প্রচেষ্টা, সাধনা আত্মপ্রকাশ করেছিল চরম ব্যর্থতারূপে। চতুর্দিকে শুধু সীমাহীন নৈরাশ্য, ব্যর্থতার হাহাকার। সমাজিক অনাচার, দুর্নীতি ও চারিত্রিক নৈরাজ্য সমগ্র বিশ্বে ব্যাপক তা"ব শুরু করে দিয়েছিল। নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এমন সব অবিবেচক ও একদেশদর্শী নীতি গৃহীত হয়েছিল যার ফলে স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক প্রেম-প্রীতির দায়িত্বানুভূতি ও কর্তব্য নিষ্ঠার পরিবর্তে নারী পরিণত হয়েছিল নিছক পুরুষের কামসহচরীতে। সংসার-জীবনের ভিত ধ্বসে পড়ার ফলে মানবিক প্রেম-প্রীতির পরিবর্তে স্বার্থবাদিতা ও ভোগ-লিপ্সার বিজয় সূচিত হয়েছিল। অর্থনৈতিক শোষণ, সামাজিক নৈরাজ্য, রাজনৈতিক জুলুম-অত্যাচার, বে-ইনসাফী ছিল সেদিনের বিশ্বের সামগ্রিক রূপ।

ঐতিহাসিক আল্লামা শিবলী নোমানী (রহ.) বলেন, তৎকালীন সময়ে বিশেষভাবে আরবদেশে দেব-দেবীর নামে নরবলি দেওয়া হত। পিতার বিবাহিত স্ত্রীকে পুত্ররা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করত। দু'সহোদরা বোনকে এক ব্যক্তি একই সঙ্গে বিয়ে করতে পারতো। স্ত্রীদের কোনো সংখ্যা নিরূপিত ছিল না। জুয়া, মদ্যপান, ব্যভিচার ইত্যাদি পাপানুষ্ঠানের ব্যাপক প্রসার ছিল। লজ্জাহীনতা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল যে, আরবের কবিশুরু রাজপুত্র ইমরাউল কায়েস স্বীয় কবিতায় আপন ফুফাতো ভগ্নির সাথে তার কেলেংকারীর কাহিনী অত্যন্ত রসঘনরূপে বর্ণনা করেছিল। তার এ

শালীনতাবর্জিত কবিতা কাবা ঘরের সম্মুখে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। যুদ্ধ-বিগ্রহে মানুষকে জীবন্ত দগ্ধ করা, মেয়ে লোকের পেট কেটে ফেলা, নিষ্পাপ শিশুদের হত্যা করা সর্ম্পূণ বৈধ ছিল। অনুরূপ দুরাবস্থা শুধু যে আরবদেশেই বিরাজ করছিল তা নয়, বরং অন্ধকারের কালো মেঘ গ্রাস করে ফেলেছিল সমগ্র পৃথিবীকে।[১]

এ বিশ্বগ্রাসী ঘণীভূত অন্ধকার দূরীভূত করে বিশ্ববাসীকে আলোকিত করার জন্য কি একটি অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের প্রয়োজন ছিল না? উত্তরে বলবো, নিশ্চয় প্রয়োজন ছিল। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক তাঁর পবিত্র কালামে ইরশাদ করেছেন,

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ
وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٦٤﴾

'আল্লাহ পাক সুবহানুহু ওয়া তাআলা মুমিনদের কাছে তাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করে অবশ্যই বড় অনুগ্রহ করেছেন। তিনি (রাসূল) আল্লাহর আয়াতসমূহ তাদের পাঠ করে শোনান, তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। যদিও তারা এর পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল।'[২]

উক্ত আয়াত গভীরভাবে নিরীক্ষণ করলে একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে অগণিত নেয়ামত প্রদান করেছেন। তিনি শারীরিক ও আর্থিক নেয়ামত এবং দীনী ও দুনিয়াবী নেয়ামতসহ অসংখ্য নেয়ামত প্রদান করেছেন। যেগুলো একের পর এক গণনা করা আদৌ সম্ভব নয়। তিনি পবিত্র কালামে ইরশাদ করেছেন,

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ﴿١٨﴾

'তোমরা যদি আল্লাহর নেয়ামতসমূহ গণতে শুরু কর তাহলে ইহা গণে শেষ করতে পারবে না।'[৩]

এভাবে কুরআনের আরও অনেক স্থানে এর উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু কোনো আয়াতে একথা বলা হয়নি যে, আমি তোমাদের ওপর বড় ইহসান করেছি। একমাত্র এ আয়াতেই বলেছেন। ঈমানদারদের নিকট এটি বড় ইহসান। এভাবে যে, তিনি তাঁর প্রিয় হাবীব (সা.)-কে তাদের কাছে প্রেরণ

---

[১] শিবলী নু'মানী, *সীরাতুন্নবী*, খ. ১, পৃ. ১৪২
[২] আল-কুরআন, *সুরা আলে ইমরান*, ৩:১৬৪
[৩] আল-কুরআন, *সুরা আন-নাহল*, ১৬:১৮

করেছেন। মানবজাতি জাহিলিয়াতের ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত থেকে বিভিন্ন নেয়ামত ভোগ করে বেপরোয়াভাবে জীবন-যাপন করা প্রকৃতপক্ষে তা ছিল সম্পূর্ণ নিষ্ফল বা মূল্যহীন। এজন্য মানুষের জীবনকে সুন্দর ও মূল্যবান করার জন্য আল্লাহ পাক সুবহানুহু ওয়া তাআলা রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমে জীবন-বিধান আল কুরআন পাঠিয়েছেন। মহানবী (সা.)-এর রিসালতের সর্বপ্রথম দায়িত্ব ছিল মানুষের কাছে তওহীদের দাওয়াত পৌঁছানো। তাই তিনি বিশ্বমানবকে সম্বোধন করে বলেছেন,

اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ ۚ

'হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রভুর ওপর বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তদানুযায়ী তাঁর বন্দেগি করতে থাক।'[১]

তিনি আরও শিক্ষা দিলেন যে,

اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ

'সেই খোদার বন্দেগি কর যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং সাথে সাথে রাসূলের ও (সা.) আনুগত্য করতে থাক।'[২]

যেমন ইরশাদ হয়েছে,

وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ

'কেননা আল্লাহর প্রেরিত রাসূল (সা.) কিতাবুল্লারই শিক্ষা দিচ্ছেন।'[৩]

সে জন্য বলা হয়েছে,

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ

'যে ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর আনুগত্য স্বীকার করে সে যেন আল্লাহরই আনুগত্য করে।'[৪]

উল্লিখিত আয়াতে গভীরভাবে চিন্তা করলে একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর আদেশ ও নির্দেশাবলি ঈমানদারদের মেনে চলার জন্য রাসূল (সা.) শিক্ষা দিয়েছেন, যা মানবসৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য। ঈমানদারদেরকে তাযকিয়া বা পরিশুদ্ধির পদ্ধতিও তিনি শিখিয়ে দিয়েছেন। যা দ্বারা প্রকাশ্যে

---

[১] আল-কুরআন, *সুরা আলে ইমরান*, ৩:১৯৩

[২] আল-কুরআন, *সুরা আল-বাকারা*, ২:২১

[৩] আল-কুরআন, *সুরা আন-নিসা*, ৪:৫৯

[৪] আল-কুরআন, *সুরা আন-নিসা*, ৪:৮০

তারা বিভিন্ন ধরনের নাফরমানি ও পাপ কাজসমূহ হতে পরিশুদ্ধি লাভ করতে পারে। যেমন– কুফরী, শিরক, বিদআত, মুনাফিকি, প্রতারণা, মিথ্যা, যিনা-ব্যভিচার, চুরি, রক্তপাত, প্রতিশ্রুতিভঙ্গ ও আমানতের খেয়ানত ইত্যাদি।

আর যাতে এরা বিভিন্ন গোপন স্বভাব থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। যেমন– গর্ব, অহঙ্কার, আত্ম-গৌরব, পরনিন্দা, প্রতিহিংসা, কৃপণতা, লোভ-লিপ্সা ইত্যাদি বর্জন এবং আল্লাহ ও মানুষের কাছে যেগুলো প্রশংসনীয় তা গ্রহণ করার শিক্ষার দায়িত্ব রাসূল (সা.) পালন করেছেন। যেমন– ঈমান, ইলম, আমল, ইবাদত, সবর, শুকর, স্বল্পে তুষ্টি, দান, আল্লাহর ওপর সন্তুষ্টি (রেযা বিল কাযা), সব বিষয়ে আল্লাহর ওপর সোপর্দ (তাফবীজ) ও আত্মসমর্পন (তাসলীম)। যেমন– রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ ফরমায়েছেন,

«تَخَلَّقُوْا بِأَخْلَاقِ اللهِ».

'তোমরা আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হও।'[১]

উল্লিখিত বিষয়ের মাধ্যমে আমাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে তা ভাস্বর হয়েছে যে, মানুষের জীবনের মূল্য ও সৃষ্টির লক্ষ্য, পার্থিব ধন-দৌলত, ভোগ-বিলাস ও বাহ্যিক নেয়ামত দ্বারা সাফল্য অর্জন করা নয়, আল্লাহর আয়াতসমূহের শুধু জ্ঞান করাও যথেষ্ট নয়, বরং বাহ্যিক ও আত্মিক পরিশুদ্ধির জ্ঞান লাভ করার সাথে সাথে জীবনের সর্বস্তরে আল-কুরআনের বিধানসমূহ বাস্তবায়ন করতে পারলেই সুন্দর জীবন, সৃষ্টির লক্ষ্য অর্জন এবং পৃথিবীতে রাসূল (সা.)-এর আগমণের উদ্দেশ্য সার্থক হয়।

যেসব সাহাবায়ে কেরাম নবী করীম (সা.)-এর শিক্ষায়-শিক্ষিত হয়েও তাঁর আদর্শ গ্রহণ করে শুধু আল্লাহর রাসূল (সা.)-কে সন্তুষ্ট করেননি, বরং বিশ্ববাসীর কাছেও প্রশংসনীয় হয়ে ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন, তাঁদের ত্যাগ স্বীকার ও মানবসেবা সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। যেমন– উদাহরণ হিসেবে পেশ করা যায় যে, ইয়ারমুকের যুদ্ধে অসংখ্য সাহাবী শাহাদত বরণ করেছেন। আহত অবস্থায় যখন তাঁরা উষ্টাগতপ্রাণ হয়ে মাটির ওপর রক্তে রঞ্জিত হয়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছিলেন, ঠিক সে মুহূর্তে হযরত ইবনে হুযাইফা (রাযি.) পানির মশক কাঁধে বয়ে আহতদের পানি পান করানোর নিমিত্ত গিয়েছিলেন। এক দিক থেকে 'পিপাসা' ধ্বনি শুনে এগিয়ে গেলেন। দেখতে পেলেন এক আহত মুসলমান পানির তৃষ্ণায় ছটফঠ করছে। তিনি ইচ্ছে করলেন যে, তাঁকে পানি পান করাতে। তখন তিনি একথা

---

[১] আস-সুয়ুতী, *তা'য়ীদুল হাকীকাতিল আলিয়া ওয়া তাশয়ীদুত তারীকাতিশ শাযিলিয়া*, পৃ. ১০৫

বললেন, ওহে আল্লাহর বান্দাহ! আমার চেয়েও অধিক আহত বান্দাহ তৃষ্ণায় ছটফট করছেন। তাঁকে গিয়ে আগে পানি পান করান। যখন ইবনে হুযাইফা (রাযি.) সেই ব্যক্তির কাছে গেলেন এবং তাঁকে যখন পানি পান করাতে চাইলেন তখন তিনি বলতে লাগলেন, ওহে আল্লাহর বান্দাহ! আমার চেয়েও পিপাসায় বেশি ছটফট করছেন এরকম আহত ব্যক্তি রয়েছেন। তাঁকে আগে পানি পান করান। যখন ওই ব্যক্তির কাছে ইবনে হুযাইফা (রাযি.) পানি নিয়ে গেলেন তখন তিনিও অন্য মুসলমান যে আহত হয়েছেন তাঁর কাছে নিয়ে যেতে বললেন। এমনিভাবে পানি কেউ পান করলেন না। কাছে গেলে যাকে প্রথম পানি পান করার জন্য তিনি অনুরোধ করেছিলেন দেখা গেল যে, তিনি শহীদ হয়ে গেছেন। এমনিভাবে দ্বিতীয় ব্যক্তি, তৃতীয় ব্যক্তি সবাই শাহাদতের অমৃত সুধা পান করে গেলেন।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এরা ছিল সেসব লোক যারা পথিকের ধন-সম্পদ লুট করতো, একে অপরের রক্ত কুণ্ঠাবোধ করতেন না। তাঁরাই মহানবী (সা.)-এর মহামূল্যবান শিক্ষার মাধ্যমে হয়ে গেলেন এমন চরিত্র ও ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পন্ন, তাঁরা ভ্রাতৃত্বের এবং ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ হয়ে স্বীয় জীবনের শেষ রক্ত বিন্দুটুকু দিতেও দ্বিধা বোধ করেননি। তাই আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ ﴿١٦٤﴾

'আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে বড়ই অনুগ্রহ করেছেন।'[১]

আমরা আরও দেখতে পাই যে, একদিন রাসূল (সা.)-এর ঘরের মধ্যে কয়েকজন মেহমান আসলেন। কিন্তু হুযুর (সা.)-এর কাছে তাঁদেরকে মেহমানদারি করার মতো কিছু ছিল না। তখন রাসূল (সা.) ঘোষণা করলেন, 'এমন কোনো ব্যক্তি আছে কি যে রাসূল (সা.)-এর মেহমানদেরকে সাথে নিয়ে খাওয়া-দাওয়া এবং আরামে থাকার ব্যবস্থা করতে পারে?' প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু তালহা (রাযি.) আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) আপনার মেহমান আমাকে দিন। পরক্ষণে সে তাঁদেরকে নিয়ে বাড়ি চলে আসলেন। হযরত আবু তালহা (রাযি.) স্বীয় স্ত্রী উম্মে সুলাইম (রাযি.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, মেহমানদের উপযুক্ত কোনো খাবার প্রস্তুত আছে কি? স্ত্রী বললেন খাবার তো স্বল্প, যদি মেহমান খায় তাহলে বাচ্চারা উপবাস থাকবে, যদি বাচ্চারা খায় তাহলে মেহমানরা উপবাস থাকবেন। হযরত আবু

---

[১] আল-কুরআন, *সুরা আলে ইমরান*, ৩:১৬৪

তালহা (রাযি.) বললেন, বাচ্চাদেরকে উপবাস অবস্থায় শোয়ায়ে দাও এবং রাসূল (সা.)-এর মেহমানদেরকে খাবার দিয়ে দাও। পূত-পবিত্র স্ত্রী এভাবেই করল যে, বাচ্চাদেরকে উপবাস রেখে শোয়ায়ে দিলেন এবং সব খাবার মেহমানদের সামনে উপস্থিত করে দিলেন। যখন খাবার মেহমানদের সামনে উপস্থিত হল তখন মেহমানরা বারবার হযরত তালহা (রাযি.)-কে ডাকলেন, আপনি আমাদের সাথে খাবারে শরীক হোন। এদিকে হযরত আবু তালহা (রাযি.) তাঁর প্রজ্ঞাসম্পন্না স্ত্রীকে নির্দেশ দিলেন, বাতি নিভিয়ে দাও। উম্মে সুলাইম বাতি ঠিক করার ভান করে নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকার করে দিলেন। তখন হযরত আবু তালহা (রাযি.) মেহমানদের আনুগত্য করত এবং তাদেরকে সান্ত্বনাদানের নিমিত্ত ভালবাসার প্রতীকস্বরূপ হাত খাবারের দিকে নিয়ে পুনরায় শূন্য হাত মুখের দিকে নিয়ে যেতেন যাতে মেহমানরা একথা বুঝতে পারে যে, হযরত আবু তালহা (রাযি.)ও তাঁদের সাথে খাবার খাচ্ছেন। কিন্তু হযরত আবু তালহা (রাযি.) একটি দানাও খেলেন না। সমস্ত খাবার মেহমানদেরকে খেতে দিলেন এবং রাতে আরামের সাথে মেহমানদেরকে নিদ্রার বন্দোবস্ত করলেন।

যখন ফজরের নামাযে হযরত আবু তালহা (রাযি.) হযরত (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন তখন হঠাৎ করে হুযুর (সা.) বলে উঠলেন, 'ওহে আবু তালহা (রাযি.)! তুমি আজ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে ফেলেছ। আল্লাহ তোমার এ অকৃত্রিম মেহমানদারির কথা ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন এবং আল্লাহ আরও বলেছিলেন, ওহে ফেরেশতাকুল! তোমরা দেখ কিভাবে আমার বান্দাহ আবু তালহা (রাযি.) আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।'

যে জাতি একদিন স্বীয় উদরভর্তি করার জন্য মুসাফিরদেরকে হত্যা করতেন আজ তাঁরা মুসাফিরদের জন্য স্বীয় মাসুম বাচ্চাদেরকে উপবাস অবস্থায় ঘুমিয়ে রেখে নিজেও অভূক্ত থেকে বিশ্ববাসীর কাছে যে নজির স্থাপন করে গেছেন তা ছিল প্রকৃতপক্ষে মহানবী (সা.)-এর সেই মহান শিক্ষা।

উপসংহারে বলবো, মহানবী (সা.)-এর আগমণ মানবকূলের জন্য আল্লাহপ্রদত্ত বিরাট একটা ইহসান। এটি অন্য কোনো নেয়ামতের সাথে তুলনীয় হতে পারে না। অতএব এ মহান ইহসানের যথাযথ শুকরিয়া আদায় করে মহানবীর অনুসৃত পথ অনুসরণ করার মাধ্যমে স্বীয় জীবন গঠন করা আমাদের অপরিহার্য কর্তব্য।

সর্বোত্তম জিহাদ

জিহাদে আকবর মানে সর্বোত্তম বা সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ। আল্লাহর পথে চলতে বাধা সৃষ্টিকারী শত্রুর বিরুদ্ধে মুসলমানদের সংগ্রাম, বিরোধিতা ও যুদ্ধকে বলা হয় জিহাদ। এ জিহাদ প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয। কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফের অসংখ্য জায়গায় আল্লাহ পাক জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করার হুকুম দিয়েছেন। জিহাদের চূড়ান্ত পর্যায়ে কাফির ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ও লড়াইয়ের কথা বলা হয়েছে, তার অপর নাম কিতাল।

আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টিকারী শত্রু দু'প্রকার। একটি জাহেরী বা প্রকাশ্য শত্রু। যেমন– ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বা ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধরত কাফির-মুশরিক ও বেদীন। অপরটি বাতেনী বা অভ্যন্তরীণ শত্রু। এ শত্রু মানুষের মনের মাঝেই রয়েছে। যার নাম নফস এবং তার বড় সহযোগী হচ্ছে আল্লাহর দরবার হতে বিতাড়িত জিন বংশোদ্ভূত শয়তান। নফস এ শয়তানকে নিয়ে মানুষের ভেতরে রূহ ও বিবেকের বিরুদ্ধে অহরহ যুদ্ধে লিপ্ত। উভয় প্রকার শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও সাধনার নাম হচ্ছে জিহাদে আসগর ও জিহাদে আকবর। ছোট জিহাদ ও বড় জিহাদ।

শরীয়তের পরিভাষা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রকাশ্য শত্রু অর্থাৎ কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যে সংগ্রাম ও লড়াই তার নাম জিহাদে আসগর বা ছোট জিহাদ আর মানুষের ভেতরকার নফসের বিরুদ্ধে রূহের যে জিহাদ তার নাম জিহাদে আকবর, সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ। হযরত নবী করীম (সা.)-এর একটি হাদীসের আলোকেই এই নামকরণ করা হয়েছে। তবুক যুদ্ধ হতে মদীনায় ফেরার পর হযরত নবী করীম (সা.) সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে বলেন,

«رَجعْنَا مِنَ الْـجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْـجِهَادِ الْأَكْبَرِ».

'আমরা ছোট জিহাদ হতে বড় জিহাদে ফিরে এসেছি।'[১]

এ হাদীসে প্রকাশ্য শত্রু অর্থাৎ কাফির-মুশরিকদের সাথে লড়াই করাকে ছোট জিহাদ বলা হয়েছে এবং নফস ও তার সহযোগী শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও সাধনাকে জিহাদে আকবর নামে অভিহিত করা হয়েছে। কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতেও আমরা এ জিহাদের হুকুম দেখতে পাই। সূরা হজের ৭৮ আয়াতের প্রথমাংশে আল্লাহপাক ইরশাদ করেন,

وَجَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ۚ

'তোমরা আল্লাহর জন্য জিহাদ কর, যেভাবে জিহাদ করা উচিত।'[২]

তাফসীরে *মাআরিফুল কুরআনে*[৩] এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

> *'جِهَادٌ (জিহাদ) ও مُجَاهَدَةٌ (মুজাহাদা) শব্দের অর্থ কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করা এবং তজ্জন্য কষ্ট স্বীকার করা। কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও মুসলমানরা তাদের কথা, কর্ম ও সর্বপ্রকার সম্ভাব্য শক্তি ব্যয় করে। তাই এই যুদ্ধকেও জিহাদ বলা হয়। حَقَّ جِهَادِهٖ ۚ (যেভাবে জিহাদ করা উচিত)-এর অর্থ আল্লাহর ওয়াস্তে জিহাদ করা, তাতে জাগতিক নাম-যশ ও গনীমতের অর্থ লাভের লালসা না থাকা।'*
>
> *... হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক বলেন, 'এ স্থলে জিহাদ বলতে নিজ প্রবৃত্তি (নফস) ও অন্যায় কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে জিহাদ করা বুঝানো হয়েছে এবং এটাই حَقَّ جِهَادِهٖ ۚ অর্থাৎ যথাযোগ্য জিহাদ।' ইমাম বগভী প্রমুখ এই উক্তির সমর্থনে একটি হাদীসও হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার সাহাবায়ে কিরামের একটি দল কাফিরদের বিরুদ্ধে অভিযান শেষে ফিরে এলে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন,*

---

[১] আল-বায়হাকী, ***আয-যুহদুল কবীর***, পৃ. ১৬৫, হাদীস: ৩৭৩:

عَنْ جَابِرٍ ﵁، قَالَ: قَدِمَ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَوْمٌ غُزَاةٌ، فَقَالَ ﷺ: «قَدِمْتُمْ خَيْرَ مَقْدَمٍ مِنَ الْـجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْـجِهَادِ الْأَكْبَرِ»، قَالُوْا: وَمَا الْـجِهَادُ الْأَكْبَرُ؟ قَالَ: «مُجَاهَدَةُ الْعَبْدِ هَوَاهُ».

[২] আল-কুরআন, ***সূরা আল-হজ***, ২২:৭৮

[৩] মুফতী মুহাম্মদ শফী, ***তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন***, খ. ৬, পৃ. ২৮৫–২৮৬

«قَدِمْتُمْ خَيْرَ مَقْدَمٍ مِنَ الْـجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْـجِهَادِ الْأَكْبَرِ»، ... قَالَ: «مُجَاهَدَةُ الْعَبْدِ هَوَاهُ».

অর্থাৎ 'তোমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে চমৎকারভাবে ফিরে এসেছ।'[১] উদ্দেশ্য এই যে, প্রবৃত্তির অন্যায় বাসনা-কামনার বিরুদ্ধে জিহাদ এখনও অব্যাহত আছে।

... তাফসীরে মাযহারীতে এই তাফসীর অবলম্বনে করে (উক্ত) আয়াত থেকে একটি তত্ত্ব উদ্ঘাটন করা হয়েছে। তা এই যে, সাহাবায়ে কিরাম যখন কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদে রত ছিলেন, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ তখনও চালু ছিল; কিন্তু হাদীসে একে ফিরে আসার পরে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, প্রবৃত্তির বাসনার বিরুদ্ধে জিহাদ যদিও রণক্ষেত্রেও অব্যাহত ছিল। কিন্তু স্বভাবতই এই জিহাদ শায়খে-কামেলের সংসর্গ লাভের উপর নিভরশীল। তাই জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিতির পরই তা শুরু হয়েছে।'[২]

কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের বেলায় যদি মনের মধ্যে জাগতিক যশ-নাম, খ্যাতি ও গনীমতের অর্থ লাভের লালসা থাকে তাহলে জিহাদ হবে না, বরং সে ধরনের নিয়তে জিহাদ করতে গিয়ে নিহত হলে শহীদের দরজা নিয়ে বেহেশত লাভের পরিবর্তে জাহান্নামী হওয়ার আশংকা রয়েছে। কাজেই দেখা যায়, জাগতিক নাম-যশ ও গনীমতের অর্থের লোভ দূর করা এবং সহীহ আল্লাহর ওয়াস্তে জিহাদের জন্য নিয়ত পরিশুদ্ধ করা অতীব প্রয়োজন। নিঃসন্দেহে এ কাজটি নফস বা প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম-সাধনা ও জিহাদের মাধ্যমে সম্ভবপর হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ বা আধ্যাত্মিক সাধনাকে জিহাদে আকবর নামে অভিহিত করা একান্তই যুক্তিযুক্ত। *তাফসীরে হুসাইনী*[৩]তে সূরা আল-হজের উল্লিখিত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

وجہاد دو است یکے باد شمنان ظاہر چون اہل شرک وبغی ودیگر با اعادی باطن چون نفس وہوا، چنانچہ حضرت رسالت پناہ ﷺ بعد از رجوع از غزوہ تبوک فرمود کہ: «رَجعْنَا مِنَ الْـجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْـجِهَادِ الْأَكْبَرِ».

---

[১] (ক) আল-বায়হাকী, ***আয-যুহদুল কবীর***, পৃ. ১৬৫, হাদীস: ৩৭৩; (খ) আল-বাগাওয়ী, ***মা'আলিমুত তানযীল ফী তাফসীরিল কুরআন***, খ. ৩, পৃ. ৩৫৪, হাদীস: ১৪৭১

[২] কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, ***আত-তাফসীরুল মাযহারী***, খ. ৬, পৃ. ৩৩৪–৩৩৫

[৩] আল-কাশিফী, ***আল-মাওয়াহিবুল ইল্লিয়া = তাফসীরে হুসাইনী***, পৃ. ৭৪৭

... وازین است کہ اِمام قشیر یؒ فرمودہ کہ: حق جہاد آنست کہ یک چشم زدن از مجاہدہ نفس باز نہ ایستد زیرا کہ ازو ایمن نتوان بود: «وَأَعْدَىٰ عَدُوَّكَ نَفْسُكَ الَّتِيْ بَيْنَ جَنْبَيْكَ» اشارت بدین است.

'জিহাদ দু'প্রকার: একটি জাহেরী দুশমন অর্থাৎ মুশরিক ও বিদ্রোহীদের সাথে। অপরটি বাতেনী দুশমন অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনার সাথে। যেমন নবী করীম (সা.) তবুক যুদ্ধ হতে ফেরার পর ইরশাদ করেন যে,

«رَجعْنَا مِنَ الْـجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْـجِهَادِ الْأَكْبَرِ».

'আমরা ছোট জিহাদ হতে বড় জিহাদের দিকে ফিরে এসেছি।'[১]

এ কারণে হযরত ইমাম আবদুল করীম আল-কুশাইরী (রহ.)[২] *বলেছেন যে, 'حَقَّ جِهَادِهٖ বা যথাযোগ্য জিহাদের অর্থ হলো চোখের পলক মারতে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণও নফসের সাথে জিহাদ থেকে বিরত না থাকা চাই। কেননা নফসের ব্যাপারে নির্ভয় হওয়া কোনো মতেই সম্ভব নয়। এদিকেই ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে,*

«وَأَعْدَىٰ عَدُوَّكَ نَفْسُكَ الَّتِيْ بَيْنَ جَنْبَيْكَ».

'তোমার সবচেয়ে মারাত্মক শত্রু হলো, তোমার দু'পাঁজরের মধ্যস্থিত নফস।'[৩]

এদিকে ইঙ্গিত করেই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

«جَاهِدُوْا أَهْوَاءَكُمْ كَمَا تُجَاهِدُوْنَ أَعْدَاءَكُمْ».

'তোমাদের প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে এমনভাবে জিহাদ কর যেমনটি ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করে থাক।'[৪]

---

[১] আল-বায়হাকী, ***আয-যুহদুল কবীর***, পৃ. ১৬৫, হাদীস: ৩৭৩:

عَنْ جَابِرٍ ﷺ، قَالَ: قَدِمَ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَوْمٌ غُزَاةٌ، فَقَالَ ﷺ: «قَدِمْتُمْ خَيْرَ مَقْدَمٍ مِنَ الْـجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْـجِهَادِ الْأَكْبَرِ»، قَالُوْا: وَمَا الْـجِهَادُ الْأَكْبَرُ؟ قَالَ: «مُجَاهَدَةُ الْعَبْدِ هَوَاهُ».

[২] আল-কুশায়রী, ***লাতায়িফুল ইশারাত***, খ. ২, পৃ. ৮

[৩] আল-বায়হাকী, ***আয-যুহদুল কবীর***, পৃ. ১৫৬, হাদীস: ৩৪৩

[৪] মুহাম্মদ রশীদ রেযা, ***তাফসীরুল মানার***, খ. ১০, পৃ. ২৬৯

সূরা আল-আনকাবুতের শেষ আয়াতেও আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝٦٩

'যারা আমার জন্য জিহাদ করে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।'[১]

তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআনে এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে,

'جِهَادٌ-এর আসল অর্থ ধর্মের পথে বাধা-বিপত্তি দূর করার জন্য পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা। কাফির ও পাপিষ্ঠদের পক্ষ থেকে আগত বাধা-বিপত্তি এবং প্রবৃত্তি ও শয়তানের পক্ষ থেকে আগত বাধা-বিপত্তি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। তবে জিহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকার হচ্ছে, কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া।

উভয় প্রকার জিহাদের ব্যাপারে আলোচ্য আয়াতে ওয়াদা করা হয়েছে যে, যারা জিহাদ করে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করি। অর্থাৎ যেসব ক্ষেত্রে ভালো-মন্দ, সত্য অথবা উপকার ও অপকারের সন্দেহ জড়িত থাকে, কোন্ পথ ধরতে হবে তা চিন্তা করে কুল-কিনারা পাওয়া যায় না, সেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা জিহাদকারীদেরকে সোজা, সরল ও সুগম পথ বলে দেন, অর্থাৎ যে পথে তাদের কল্যাণ নিহিত সেই পথের দিকে মনকে আকৃষ্ট করে দেন।'[২]

কোন কোন তাফসীরকার উল্লেখিত আয়াতের فِيْنَا ۝٦٩ শব্দ থেকে গভীর তত্ত্ব উদঘাটন করে বলেছেন যে فِيْنَا ۝٦٩ শব্দের فِيْ ۝٦٩ এবং نَا ۝٦٩-এর মাঝখানে একটি مُضَافٌ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ فِيْ رِضَائِنَا ও فِيْ تَقَرُّبِنَا ,فِيْ طَلَبِنَا এভাবেই অর্থ করতে হবে। তার মানে আমার জন্য, আমার সন্ধানে, আমার সান্নিধ্যের জন্য বা আমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যারা সাধনা করবে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। আয়াতের শেষাংশে الْمُحْسِنِيْنَ ۝٦٩ শব্দটি উল্লেখিত তাফসীরকেই সমর্থন করে। সালেহ শব্দের অর্থ

---

[১] আল-কুরআন, *সূরা আল-আনকাবুত*, ২৯:৬৯

[২] মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন*, খ. ৬, পৃ. ৭০৬

সৎকর্মপরায়ণ। পক্ষান্তরে মুহসিন শব্দের আসল অর্থ হচ্ছে, 'যারা আল্লাহকে হাজের-নাজের জেনে আল্লাহর আদেশসমূহ পালনও নিষেধসমূহ পরিহার করে চলেন।'

তাফসীরে হুসাইনীতে এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে,

وایراد مجاہدہ کرد بطریق اطلاق تا متناول باشد جا، د ظاہر و باطن را ، پس آنانکہ جہاد کنند در راہ ما با دشمنان دین و با نفس و ہوا بنمائیم ایشانرا راہ وصول بدولت لقا۔

سہل عبد اللہ تستری قدس سرہ فرمود کہ: ہر کہ کوشش کند در اقامت سنت بنمائیم اورا سبل جنت۔

وامام قشیریؒ فرمودہ کہ: آنانکہ بیارایند ظاہر خود را بمجاہدات آرایش دہیم باطن ایشانرا بمشاہدات۔

شیخ ابو بکر واسطی روّح اللہ روحہ میفرماید: ہر کہ جدتی کند برای ما راہ دہیم اورا بسوی خود.

در «بحر الحقائق» آوردہ کہ ہر کہ کوشش کند در طلب ما می نمائیم اورا راہ دریافت ما

إِلَّا مَنْ طَلَبَنِيْ وَجَدَنِيْ ہر کہ ما را جوید ما را۔

'এখানে جَاهَدُوا-এর শব্দ মূল مُجَاهَدَةٌ (মুজাহাদা) শব্দটি মুতলাক (ব্যাপক অর্থবোধক) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে জাহেরী ও বাতেনী উভয় প্রকার জিহাদ বোঝা যায়। ফলে এর অর্থ দাঁড়ায়, যে ব্যক্তি আমার রাস্তায় দীনের দুশমনদের সাথে এবং নফস ও কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে জিহাদ করে আমি তাদেরকে আমার সাথে মিলনের সহজ পথ দেখিয়ে দেই।

হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তাশতারী (রহ.) বলেন, যে ব্যক্তি মুজাহাদা (আত্মিক সাধনার) দ্বারা নিজের বাইরের দিককে সুন্দর করে নেয়, আমি মুশাহাদার (সৃষ্টিরহস্য দেখানোর) মাধ্যমে তার বাতেন ও ভেতরের জগতকে সাজিয়ে দেই।

শায়খ আবু বকর ওয়াসিতী (রহ.) এ আয়াতের অর্থ এভাবে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন যে, 'যে ব্যক্তি আমার জন্য চেষ্টা করে আমি তাকে আমার দিকে আসার পথ করে দিই।'

প্রসিদ্ধ কিতাব বাহরুল হাকায়িক-এ বলা হয়েছে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি আমাকে পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে তাকে আমি আমাকে পাওয়ার পথ বাৎলে দেই। إِلَّا مَنْ طَلَبَنِيْ وَجَدَنِيْ *অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমাকে তালাশ করেছে, সে আমাকে পেয়েছে।'*[১]

সূরা আল-আনকাবুত মক্কী সূরা, অর্থাৎ মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। রাসূলে পাক (সা.) মদীনায়ে মুনাওয়ারায় হিজরত করার পরই মুসলমানদের ওপর কাফির মুশরিকদের সাথে প্রকাশ্যে যুদ্ধ করার হুকুম নাযিল হয়। কাজেই মক্কায় অবতীর্ণ সূরা আল-আনকাবুতের উল্লেখিত আয়াতে জিহাদের যে নির্দেশ তা নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য প্রদান করা হয়েছে বলেই মানতে হবে। হাদীস শরীফে নফসের সাথে জিহাদকারীর পরিচয় প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে,

«الْـمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ».

'প্রকৃত মুজাহিদ ওই ব্যক্তি যে নিজের নফসের সাথে জিহাদ করে।'[২]

নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও সাধনাকে সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ বলার আরও একটি তাৎপর্য হলো, কাফির, মুশরিক ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের পরিচালিত যুদ্ধ কোন বিশেষ সময়েই সংঘটিত হয়- যখন ইসলামও মুসলমানদের ওপর শত্রুদের আঘাত আসে। যুদ্ধের জয় পরাজয় নির্ধারিত হওয়ার পর সে জিহাদ বন্ধ থাকে। কিন্তু নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ ও সংগ্রাম হরদম চালিয়ে যেতে হয়। জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ জিহাদের বিরাম নেই, শেষ নেই। এ হিসেবেও নফসের সাথে জিহাদকে জিহাদে আকবর সর্বোত্তম জিহাদ নামকরণের সার্থকতা উপলব্ধি করা যায়।

---

[১] আল-কাশিফী, ***আল-মাওয়াহিবুল ইল্লিয়া = তাফসীরে হুসাইনী***, পৃ. ৮৯৪

[২] আত-তিরমিযী, ***আল-জামি'উল কবীর = আস-সুনান***, খ. ৫, পৃ. ১৬৫, হাদীস: ১৬২১, হযরত ফাযালা ইবনে ওবাউদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত

ইসলামে নামের গুরুত্ব

প্রত্যেক মুসলমানের নাম ইসলামী শরীয়তসম্মত, সুন্দর ও অর্থপূর্ণ হওয়া একান্ত আবশ্যক। কেননা নাম মানুষের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক এবং নামের মধ্যে মানুষের ধর্ম ও কৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তাই নাম রাখার ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত অপরিহার্য। নামের সাথে পিতার নাম সংযুক্ত হওয়া অত্যন্ত জরুরি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

ٱدْعُوهُمْ لِءَابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ

'তাদেরকে তাদের পিতার নামে ডাকো, সেটাই আল্লাহ তাআলার নিকট অত্যন্ত ন্যায় সঙ্গ।'[১]

কিয়ামতের দিনেও মানুষ তাদের নাম ও পিতাদের নামে পরিচিত হবেন। এ প্রসঙ্গে নবী করীম (সা.) পবিত্র হাদীসে ইরশাদ করেছেন,

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ، وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوْا أَسْمَاءَكُمْ».

'হযরত আবুদ দরদা (রাযি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন তোমাদের নাম এবং তোমাদের পিতার নামে ডাকা হবে। অতএব তোমরা নিজেদের (সন্তানদের) নাম সুন্দর করে রাখ।''[২]

---

[১] আল-কুরআন, ***সুরা আল-আহযাব***, ৩৩:৫

[২] আবু দাউদ, ***আস-সুনান***, খ. ৪, পৃ. ২৮৭, হাদীস: ৪৯৪৮

عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْـجُشَمِيِّ – وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ – قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ:
«تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ،
وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ، وَهَمَّامٌ، وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةُ».

'হযরত আবু ওয়াহাব জাশমী (রাযি.) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 'তোমরা নবীদের নামে নাম রাখবে। আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় নাম হচ্ছে আদুল্লাহও আবদুর রহমান। সর্বোৎকৃষ্ট নাম হচ্ছে হারিস ও হাম্মাম এবং সর্বাপেক্ষা খারাপ না হচ্ছে হারব (যুদ্ধ) এবং মুররা (তিক্ত)।''[১]

উপরোক্ত হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নবীদের নামে নাম রাখা উত্তম, আবদুল্লাহ এবং আবদুর রহমান আল্লাহর কাছে প্রিয়তম নাম এবং হারিস ও হাম্মাম যথার্থ নাম। কেননা এ নাম মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নবী করীম (সা.) নবীদের নামে নামকরণের আদেশ দিয়েছেন এবং নিজেও তা আমল করেছেন। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে,

عَنْ أَبِيْ مُوْسَىٰ، قَالَ: «وُلِدَ لِيْ غُلَامٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيْمَ».

'হযরত আবু মুসা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আমি তাকে নিয়ে নবী করীম (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হই। নবী করীম (সা.) তার নাম রাখেন ইবরাহীম।'[২]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «وُلِدَ لِيْ اللَّيْلَةَ غُلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ
بِاسْمِ أَبِيْ إِبْرَاهِيْمَ».

'হযরত আনাস (রাযি.) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, 'গত রাতে আমার একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, আমি তার নাম রেখেছি আমার পিতা ইবরাহীমের নামে।''[৩]

---

[১] (ক) আবু দাউদ, ***আস-সুনান***, খ. ৪, পৃ. ২৮৮, হাদীস: ৪৯৫০; (খ) আন-নাসায়ী, ***আল-মুজতাবা মিনাস সুনান = আস-সুনানুস সুগরা***, খ. ৬, পৃ. ২১৮, হাদীস: ৩৫৬৫

[২] (ক) আল-বুখারী, ***আস-সহীহ***, খ. ৭, পৃ. ৮৩–৮৪, হাদীস: ৫৪৬৭; (খ) মুসলিম, ***আস-সহীহ***, খ. ৩, পৃ. ১৬৯০, হাদীস: ২১৪৫

[৩] (ক) মুসলিম, ***আস-সহীহ***, খ. ৪, পৃ. ১৮০৭, হাদীস: ২৩১৫; (খ) আবু দাউদ, ***আস-সুনান***, খ. ৩, পৃ. ১৯৩, হাদীস: ৩১২৬

ওলামায়ে কেরামের মতে সালফে সালিহীন, মুত্তাকী-পরহেযগার ব্যক্তিদের নামে নামকরণ পছন্দনীয়। ইবনে আবু খায়সামা (রহ.)-এর *আত-তারীখুল কবীর* নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে,

أَنَّ طَلْحَةَ كَانَ لَهُ عَشَرَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، كُلٌّ مِنْهُمُ اسْمُهُ اسْمُ نَبِيٍّ.

'হযরত তালহা (রাযি.)-এর ১০টি পুত্র ছিল, তাদের নাম ছিল নবীদের নামে।'[১]

নবী করীম (সা.) শুধু উত্তম নাম রাখার আদেশ দিয়ে ক্ষান্ত হননি, বরং তাঁর পবিত্র জীবনে তা বাস্তবায়ন করেছেন। নবী করীম (সা.)-এর সম্মুখে কেউ উপস্থিত হলে তিনি প্রথমে তাঁর নাম জিজ্ঞেস করতেন এবং তা পছন্দ হলে খুশি হতেন আর সে নিদর্শন প্রতিভাত হতো তাঁর পবিত্র অবয়বে। কিন্তু অপছন্দ হলে তাঁর মুখমণ্ডলে বিরক্তির ভাবপ্রকাশ পেতো।

কোনো গ্রাম পাহাড় ও ময়দানে প্রবেশের পূর্বে সে স্থানের নাম জিজ্ঞেস করতেন নাম পছন্দ বা শুভ হলে সেখানে প্রবেশ করতেন। একবার তাঁর যাত্রাকালে দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথে অতিক্রান্ত হবার পূর্বেই পাহাড় দুটোর নাম জিজ্ঞেস করলে তাঁকে জানানো হয় একটি নাম فَاضِحٌ (ফাদিহ) বা কলঙ্কিত এবং অপর নাম مُخْزٌ (মুখ্য) যা অসম্মানকারী। এ নাম শুনে নবী করীম (সা.) তাঁর কাফেলার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেন।[২]

নবী করীম (সা.) যেমন অশুভ, ঘৃণ্য, অর্থহীন নামের পরিবর্তন করেছেন তেমনি অতি বিশেষণমূলক আত্মগরিমা বৃদ্ধি করে এমন নামের পরিবর্তন করেছে। হযরত যায়নবের নাম ছিল বাররা অত্যন্ত (ধর্মশীল) নবী করীম (সা.) তা পরিবর্তন করে যায়নব নামকরণ করেন।[৩]

ইবনে কাইয়িম আল-জওযিয়া (রহ.) বলেন,

'নামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবেই মানুষের ভালো-মন্দ আচরণ, চরিত্র ও কর্মধারা প্রভাবিত হয়। নবী করীম (সা.)-কে মুহাম্মদ

---

[১] ইবনে কাইয়িম আল-জওযিয়া, ***তুহফাতুল মাওদূদ বি-আহকামিল মাওলূদ***, পৃ. ১২৮

[২] (ক) ইবনে কাইয়িম আল-জওযিয়া, ***তুহফাতুল মাওদূদ বি-আহকামিল মাওলূদ***, পৃ. ১২০; (খ) ইবনে কাইয়িম আল-জওযিয়া, ***যাদুল মা'আদ ফী হাদয়ি খাইরিল ইবাদ***, খ. ২, পৃ. ৩০৮

[৩] (ক) আল-বুখারী, ***আস-সহীহ***, খ. ৮, পৃ. ৪৩, হাদীস: ৬১৯২; (খ) মুসলিম, ***আস-সহীহ***, খ. ৩, পৃ. ১৬৯০, হাদীস: ২১৪৫:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ، فَقِيْلَ: تُزَكِّيْ نَفْسَهَا، فَسَمَّاهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَيْنَبَ.

(চরম প্রশংসিত) ও আহমদ (অত্যন্ত প্রশংসাকারী) নামে আহ্বান করা হয়েছে। বস্তুত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে তিনি ছিলেন আল্লাহ তাআলার প্রশংসায় সর্বোত্তম এবং পৃথিবীর সকলের কাছেই তিনি ছিলেন আল্লাহ তাআলার প্রশংসায় সর্বোত্তম এবং পৃথিবীর সকলের কাছেই তিনি চরমভাবে প্রশংসিত। নবী করীম (সা.) তাই সুন্দর নাম রাখতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। কেননা নামধারী ব্যক্তি তার নামের কারণে লজ্জাবোধ করে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে এবং নামের অর্থের সাথে সমাঞ্জস্যপূর্ণ কাজে প্রবৃত্ত হয়। এ জন্য দেখা যায় সমাজের উচ্চ শ্রেণির লোকদের নাম সুন্দর, উচ্চ মানের, ইতরজনের নাম তাদের জীবন যাত্রার মতো অশুভ, অর্থহীন ও অসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে থাকে।'[১]

মানুষের জীবনে নামের সুগভীর প্রভাব সম্পর্কে আধুনিক ইংরেজি ঔপন্যাসিক বলেন, ভালো বা মন্দ নামের বিচিত্র যাদুকরী প্রভাব অনিবার্যভাবে আমাদের চরিত ও আচরণকে প্রভাবিত করে। নামের প্রভাব যে কত গভীর তা নিম্ন বর্ণিত হাদীস থেকে আমাদের কাছ স্পষ্টভাবে প্রমাণিত:

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَتَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: «مَا اسْمُكَ»؟ قُلْتُ: حَزْنٌ، فقَالَ: «أَنْتَ سَهْلٌ» ، قَالَ: لاَ أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيْهِ أَبِيْ، قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: «فَمَا زَالَتِ تِلْكَ الْحُزُوْنَةُ فِيْنَا بَعْدُ».

'হযরত সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়িব (রাযি.)-এর দাদা বলেন, আমি নবী করীম (সা.)-এর খিদমতে উপস্থিত হলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার নাম কী?' আমি বললাম, হাযন (কর্কশ, রুক্ষ, শুষ্ক মাটি) নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, 'তোমার নাম হচ্ছে সাহল (নরম, কোমল)।' সে বলল, আমার পিতা যে নাম রেখেছে আমি তা পরিবর্তন করব না। ইবনুল মুসাইয়িব (রাযি.) বলেন, তখন থেকেই আমাদের বংশের মধ্যে ওই কর্কশতা বা রুক্ষতা বিদ্যমান ছিল।'[২]

অতএব আমাদের উচিৎ আমাদের প্রিয় নবজাত শিশুদের সুন্দর ও উত্তম অর্থবহ নাম রাখা একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য।

---

[১] ইবনে কাইয়িম আল-জওযিয়া, *তুহফাতুল মাওদূদ বি-আহকামিল মাওলূদ*, পৃ. ১৪৭

[২] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৮, পৃ. ৪৩, হাদীস: ৬১৯০; (খ) ইবনে কাইয়িম আল-জওযিয়া, *তুহফাতুল মাওদূদ বি-আহকামিল মাওলূদ*, পৃ. ১২১

প্রগতির নামে বিধর্মীদের কোনো প্রথা ধারণ, গ্রহণ ও পালন করা সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্য

লেবাস-পোষাক

পোষাক সম্পর্কে শরীয়তে কোনো নির্দিষ্ট কিছু না থাকলেও এটি অবশ্যই স্বীকৃত যে, যে দেশের অধিকাংশ আলেমসমাজ ও ধার্মিক জনগণ যে লেবাস পরিধান করেন তাই সেই দেশের জন্য ধর্মীয় লেবাস বলে বিবেচিত। অহেতুক বিদেশি ও বিজাতীয় লেবাস পরিধান করাতে আসলে কোনো জাগতিক ফায়দা নেই। হীনমন্যতার কারণেই এই জাতীয় ভাবধারার জন্ম হয়। এটাকে অবশ্যই পরিহার করতে হবে। হাদীস শরীফে আছে,

«مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ».

'যদি কেউ আচার-ব্যবহার, লেবাস-পোষাক কোনো বিজাতি বা ভিন্ন সম্প্রদায়ের অনুসরণ ও অনুকরণ করে তাকে দুনিয়া-আখিরাতে সেই সাম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হবে।'[১]

মুসলমান জ্ঞান আহরণ ছাড়া অন্য বিষয়ে কারো অন্ধ অনুকরণ করতে পারে না। কেননা মুসলমানের খোদাপ্রদত্ত ও রাসূল (সা.)-এর অনুশীলিত স্বকীয়তা ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য আছে। আপন জাতীয় সত্ত্বাকে উঁচু করে তোলে ধরা গোঁড়ামি নয়, বরং আত্মবোধেরই প্রকাশ। এটি লজ্জার নয়, গৌরবেরই প্রকাশ। সকল মুসলমান ভাই ভাই এবং বিশেষ করে আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ বংশধর স্কুল, কলেজ, ভার্সিটি ও মাদরাসার ছাত্রসমাজের মাঝে উক্ত চেতনাবোধ জেগে উঠুক এই কামনা করি।

---

[১] আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ৪, পৃ. ৪৪, হাদীস: ৪০৩১, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত

নারীর মাথার চুল

চুল নারীজাতির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। এটি তাদের যেমন আবরণ তেমন আভরণও (সৌন্দর্য)। বিজাতীয় নারীদের অনুকরণে তা কেটে-ছেঁটে ছোট করলে ধর্মমতে পাপ তো হবেই সৌন্দর্যও বিনষ্ট হবে। বিশুদ্ধ কিতাবে আছে, নারী যদি তার মাথার চুল কাটে তবে সে পাপী ও অভিশপ্তা হবে। *(আদ-দুররুল মুখতার)*

নারী পুরুষের আর পুরুষ নারীর লেবাস পরিধান করা

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَعَنَ اللهُ الْـمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، وَالْـمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ».

'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, 'যে নারী লেবাসে-পোষাকে বা আচার-আকৃতিতে পুরুষের রূপ ধারণ করে তার ওপর আল্লাহর লানত। অনুরূপভাবে যে পুরুষ নারীর রূপ ধারণ করবে তাদের ওপরও আল্লাহর অভিশাপ।''[১]

পুরুষের দাড়ি

আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর নির্দেশ হচ্ছে,

«أَوْفُوا اللِّحَىٰ، وقُصُّوا الشَّوَارِبَ».

'তোমরা দাড়ি লম্বা করে রাখ আর মোচ (গোঁফ) খাটো ও ছোট কর। অথচ আমরা আল্লাহর রাসূলের আর্দেশ লঙ্ঘন করে তার বিপরীতে দাড়ি চাঁছি আর মোচ লম্বা রাখি ভিন্ন ভিন্ন স্টাইলে।'[২]

পুরুষের মাথার টুপি ও মেয়েদের মাথার গোমটা

পুষের মাথায় টুপি ও পাগড়ি এবং মেয়েদের মাথায় গোমটা দেওয়া ইসলামী তরীকা। আমাদের দেশে একসময় জাতীয় চরিত্র এ রকমই ছিল,

---

[১] আত-তাবারানী, ***আল-মু'জামুল আওসাত***, খ. ৪, পৃ. ২১২, হাদীস: ৪০০৩

[২] আত-তাবারানী, ***আল-মু'জামুল কবীর***, খ. ১১, পৃ. ২৭৭, হাদীস: ১১৭২৪, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত

কিন্তু বিজাতীয় সংস্কৃতির কুপ্রভাবে বর্তমানে না মুসলমান পুরুষের মাথায় টুপি আছে, না নারীর মাথায় ঘোমটা। বরং অবস্থা যেন এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, ঘোমটা তো দূরের কথা বুকের কাপড়ও খসে পড়া আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। আফসোস! নারী যেন এখন বাজারের পণ্য বিশেষ। হে আল্লাহ! তাআলা মুসলমান নর-নারীকে বোধশক্তি ফিরিয়ে দিন। তাদেরকে এবং তাদের অভিভাবকদেরকে সঠিক পথে চলার তওফীক দিন।

বাড়িতে কুকুর পালা ও ঘরে মূর্তি এবং ছবি রাখা

হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন,

«لَا يَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَا صُوْرَةٌ».

'যে বাড়িতে ও ঘরে কুকুর অথবা ছবি থাকবে সেই বাড়ি ও ঘরে রহমতের খাস ফেরেশতা প্রবেশ করে না।'[১]

শিকার ধরা, গৃহপালিত পশুর পাহারা দেওয়া ও ক্ষেত্রের পাহারার কারণ ছাড়া অন্য যেকোনো কারণে ঘরে কেউ কুকুর পুষলে তার নেকির আমল হতে দৈনিক এক কীরাত করে সওয়াব কমতে থাকবে আর এক কীরাত হল ওহুদ পাহাড়ের সমান।

মানুষের শরীরের দশটি সুন্নাতে আম্বিয়া (আ.)

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ওপর আল্লাহ তাআলার তরফ হতে ১০টি সুন্নাত পালন করার জন্য অহী নাযিল হয়েছিল। আমাদের মহানবী (সা.) আপন উম্মতের জন্যও সেই ১০টি সুন্নাতের পালন পছন্দ করেছেন। তা হচ্ছে, ১. খাতনা করানো, ২. পেশাব-খায়খানা করার পর পানি দিয়ে ধোয়া, ৩. কুলি করে মুখ পরিস্কার করা, ৪. মিসওয়াক করে দাঁত পরিস্কার করা, ৫. নাকের পশম বড় হতে না দেওয়া ও পানি দিয়ে নাকের ভেতর পরিস্কার করা, ৬. বগলের পশম বড় হতে না দিয়ে কেটে পরিস্কার রাখা, ৭. নাভির নীচের পশম কামায়ে ফেলা, ৮. দাড়ি লম্বা করে রাখা, ৯. মোচ কেটে ছেঁটে খাট করে রাখা বা একেবারে এঁচে ফেলা ও ১০. হাত পায়ের নখ কেটে পরিস্কার রাখা।

---

[১] আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, খ. ৯, পৃ. ৭৪, হাদীসঃ ৯১৬৩, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত

মেয়েদের হিন্দুয়ানী কুপ্রথার অনুকরণ

মেয়েদের কপালে, মাথায়, সিন্দুর দেওয়া, কাজল ও তিলকের ফোটা দেওয়া কোনো অবস্থাতেই এসব বিজাতীয় কুপ্রথা ধারণ করা আমাদের ধর্মের মতে সম্পূর্ণই না-জায়েয।

ডান ও বাম হাতের ব্যবহার

ইসলামী সংস্কৃতি হচ্ছে সব ভালো কাজ ডান হাত ও ডান দিক হতে শুরু করা আর নিকৃষ্ট কাজে বাম হাত ব্যবহার করা। এর বিপরীত বর্তমানে আমাদের প্রগতির ধ্বজাধারীরা যা করে যথা– বাম হাতে খায়, বাম হাতে দেওয়া আর বাম হাতে নেওয়া, এটা বিজাতীয় প্রথা তা বটেই অশালীনও।

ইসলাম শালীনতারই ধর্ম। সুতরাং সকল মুসলমানের উচিত ডান হাত দিয়ে খাওয়া, দেওয়া, নেওয়া। পায়জমা পরতে ডান পা, জুতা পরতে ডান পা হতে আরম্ভ করা, গাড়িতে চড়তে ডান পা দিয়ে চড়া, মসজিদে ঢুকতে ডান পা দিয়ে ঢুকা ইসলামী আদর্শ। অনুরূপভাবে পেশাব-পায়খানার পর শৌচ করতে বাম হাত দিয়ে করা, পায়খানায় ঢুকতে বাম পা দিয়ে ঢুকা ইত্যাদি হল ইসলামী তরীকা। মহান আল্লাহ যেন আমাদেরকে যেন তাঁর পছন্দনীয় তরীকায় চলার তওফীক দান করুন।

ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যবসা-বাণিজ্য

ইসলাম সার্বজনীন ও সর্বকালীন জীবন ব্যবস্থা। মানবজীবনের সামগ্রিক বিষয়েই ইসলাম স্পষ্ট বক্তব্য ও করণীয় কাজের নির্দেশ দিয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য যেহেতু মানব জীবনের একটি অন্যতম প্রধান বিষয়। সুতরাং সংগত কারণেই ব্যবসাসংক্রান্ত ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য ও করণীয় বিষয় রয়েছে। অতএব মুসলমান ব্যবসায়ী ভাইদেরকে ব্যবসাসংক্রান্ত আল্লাহ ও রাসূল হওয়ার অর্থই হল আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর সমস্ত আদেশ-নিষেধের প্রতি বিনাবাক্য ব্যয়ে মাথা নত করে দেওয়া ও মেনে চলা।

এবার আমরা আল্লাহ তাআলার পাক কালাম ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র বাণী হতে ব্যবসা বিষয়ে অতিসংক্ষেপে আলোচনা পেশ করছি, যেন মুসলমান জনসাধারণ তথা ব্যবসায়ী ভাইগণ ব্যবসার হালাল ও হারাম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারেন এবং সৎভাবে ব্যবসা দ্বারা হালাল রুটি উপার্জন করে দুনিয়াতে সরফরাজ ও আখিরাতে নাজাত লাভ করতে পারেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে বোঝার ও আমল করবার তওফীক দান করুন। বৈধ ও অবৈধ ব্যবসা সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআলার ইরশাদ হচ্ছে,

وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ

'আল্লাহ তাআলা বৈধভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করা হালাল আর সুদযুক্ত ও অবৈধ ব্যবসাকে হারাম বলে ঘোষণা করেছেন।'[১]

কুরআনে পাকের সূরা আর-রাহমানে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,

وَ اَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ۝

[১] আল-কুরআন, *সুরা আল-বাকারা*, ২:২৭৫

‘হে ব্যবসায়ীগণ! তোমরা ব্যবসার মাল বিক্রয় করবার সময় একদম ঠিক ঠিকভাবেই মাপ দেবে এবং কখনও কোনো অবস্থাতেই ওজনে কম দেবে না।’[১]

কুরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা ফরমায়েছেন,

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۝١ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۝٢ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۝٣

‘ক্রয় বিক্রয় ওজন ও মাপের বেলায় যারা কম বেশি করে তাদের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘ওয়াইল’ নামক দোজখ সেসব ব্যবসায়ীর জন্য যারা যখন অন্যের কাছ হতে কিছু ক্রয় করে তখন তা ওজনে পুরাপুরিই নেয় আর যখন বিক্রয় করে তখন কিছু ওজনে বা মাপে কম দেয়।’[২]

হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যথা– হাদীস শরীফে আছে,

«تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ».

‘মানুষের জীবিকার (রিয্‌কের) দশমাংশের নবমাংশই আল্লাহ তাআলা ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে রেখেছেন।’[৩]

তিনি আরও ফরমায়েছেন,

«التُّجَّارُ الصَّدُوْقُ الْأَمِيْنُ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ».

‘সৎ ও বিশ্বাসী ব্যবসীয়গণ আল্লাহ তাআলার পুরস্কারপ্রাপ্ত বান্দাগণের সাথে বেহেশতে অবস্থান করবেন।’[৪]

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের উপরোক্ত আলোচনার আলোকে আমার দেশের ব্যবসায়ী ভাইদেরকে সৎভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করে আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর প্রদত্ত খোশখবরির যোগ্য হয়ে পুরস্কার পেতে এবং কারচুপির ব্যবসা হতে বিরত থেকে আল্লাহর আযাব ও গযব হতে পরিত্রাণ লাভে অনুপ্রাণিত করা আমার দীনী কর্তব্য মনে করি। এ বিষয়ের ওপর আমরা সামান্য আলোকপাত করতে প্রয়াস পেলাম।

---

[১] আল-কুরআন, ***সুরা আর-রহমান***, ৫৫:৯

[২] আল-কুরআন, ***সুরা আল-মুতাফফিফীন***, ৮৩:১–৩

[৩] আল-কাসিম ইবনে সাল্লাম, ***গরীবুল হাদীস***, খ. ৩, পৃ. ২৮৫, হাদীস: ৪৬৬

[৪] আত-তিরমিযী, ***আল-জামি‘উল কবীর = আস-সুনান***, খ. ৩, পৃ. ৫০৭, হাদীস: ১২০৯:

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ، وَالصِّدِّيْقِيْنَ، وَالشُّهَدَاءِ».

আমাদের দেশে প্রচলিত ব্যবসার প্রায়গুলোই শরীয়তের নজরে না-জায়েয। এমনকি অনেক ব্যবসা এমনও আছে যা সচরাচর হারামও। কিন্তু এ বিষয়ে ব্যবসায়ী ভাইদের ইসলামী জ্ঞানের অভাব ও না জানার কারণে না-জায়েয ও অবৈধ ব্যবসা পরিচালনা করে দুনিয়াতে সাময়িকভাবে কিছু নগদ লাভ করলেও সার্বিকভাবে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতি ও লোকসানেই পতিত হচ্ছেন।

এ ধরনের কিছু ব্যবসা নিম্নে উল্লেখ করা হল। যথা– পুকুরে ও নদীতে থাকা অবস্থায় মাছ বিক্রয়, বাগানে বা ক্ষেত্রে থাকা অবস্থায় ফল ও ফসলের বেচাকেনা, গরু-ছাগলের বাঁটে থাকা অবস্থায় দুধ এবং বনে এবং বৃক্ষে অবস্থানরত অবস্থায় পাখি বিক্রয় জায়েয নেই।

সর্বপ্রকার হারাম জিনিসের ক্রয়-বিক্রয় সর্বোতোভাবেই হারাম ও না-জায়েয। শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম পশু-পাখি এবং দ্রব্যসামগ্রীর ক্রয়-বিক্রয় অবশ্যই হারাম। সুতরাং কুকুর, শুকুর, বিড়াল, সাপ, বিচ্ছু, ব্যাঙ, কচ্ছপ, বাঘ, ভাল্লুক, সিংহ এবং মৃত জন্তু-জানোয়ার, মানুষ ও মরা মানুষের হাড়, নখ ও চুল ইত্যাদির ক্রয়-বিক্রয় হারাম।

শরাব, গাঁজা, আফিন, চড়শ তথা মাদক জাতীয় নেশার যাবতীয় বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণ হারাম। যাদুর দ্বারা উপার্জিত অর্থ, হারাম বস্তু বা মানুষ বিক্রিত অর্থ, দেব-দেবীর মূর্তি বিক্রিত অর্থ, মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে উপার্জিত টাকা পয়সা, জুয়া-লটারি দ্বারা উপার্জিত অর্থ এবং গণকগণের গণকগিরি করে উপার্জিত আয়ের সমস্ত অর্থই হারাম ও নিষিদ্ধ, সুদ দেওয়া ও সুদের ব্যাপারে সহযোগিতা ও সাক্ষী হওয়াও হারাম।

ব্যবসাসংক্রান্ত আরও ব্যাপকভাবে জানতে হলে কোনো উপযুক্ত আলেম অথবা নির্ভরযোগ্য বড় বড় কিতাবে দেখে নিতে পারেন। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সৎভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করার তওফীক দান করুন।

ঈদুল ফিতরের তাৎপর্য

ঈদ শব্দের অর্থ খুশি। এটি মুসলমানদের জন্য বড় ও অতিপবিত্র দিন। অত্যন্ত মর্যাদাশীল ও খুশির দিবস। অবশ্য রমযানের পবিত্রতা রক্ষা করে যারা রোযা রেখেছেন প্রকৃত খুশি একমাত্র তাদেরই জন্য। খোদাদ্রোহী ফাসিক ফাজিরের জন্য নয়।

ঈদুল ফিতরের খুশির পিছনে তাৎপর্য হচ্ছে, মহান রাব্বুল আলামীন ঈমানদারদের জন্য পুরো একটি মাস দিনের বেলায় পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকা ফরজ করে দিয়েছেন। কিন্তু ঈদুল ফিতরের দিন সে নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ঈদুল ফিতর এমন খুশির দিন যে, সাধারণত বছরের অন্যান্য দিনে দেখা যায় একমাত্র সামর্থবান ও সম্পদশালী লোকেরাই বিভিন্ন সাজ-সজ্জা, নতুন পোষাক-পরিচ্ছদ ও উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করে, কিন্তু পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিন এর ব্যতিক্রম। দরিদ্ররাও সম্পদশালী লোকদের ন্যায় সামর্থ অনুযায়ী রুচিশীল নতুন পোষাক পরিচ্ছদ ও সাজ-সজ্জা গ্রহণ করে এবং উন্নতমানের খাবার গ্রহণ করে। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য থাকেনা সে দিন বিন্দুমাত্র। দরিদ্র লোকেরা যাতে ধনীদের পাশা-পাশি সকল আনন্দে শরীক হতে পারে সেজন্য ধনীদের ওপর শরীয়ত কর্তৃক এ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যে, তারা যেন ঈদের নামযের পূর্বে রোযার যাকাত হিসেবে সাদকায়ে ফিতর আদায় করে দেয়। এটি তাদের ওপর ওয়াজিব করা হয়েছে।

ঈদুল ফিতরের অন্যতম তাৎপর্য হচ্ছে, এটি মুসলিমসমাজের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। ইসলামের দৃষ্টিতে যারা বিভিন্ন কারণে ৫ ওয়াক্ত নামাযে একত্রিত হয় না বা জুমার নামাযেও একত্রিত হতে পারে না, কিন্তু তারাও পবিত্র ঈদের দিনে বিভিন্ন এলাকা থেকে একত্রিত হওয়ার সুযোগ

পায়। ফলে ঈমানী ভ্রাতৃত্ব উন্মুক্ত ও অনাবিল মনে অন্তরভরা মায়াও মমতা নিয়ে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা পরিহার করে একে অপরের সাথে সালাম বিনিময় ও কোলাকুলি করে। এভাবে ইসলামে সাম্যের নীতির প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় পবিত্র হাদীসের মর্মানুযায়ী যারা পবিত্র রমযান মাস পাওয়ার পরও স্বীয় জীবনকে পাপসমূহ থেকে পবিত্র করতে পারেনি প্রকৃত অর্থে তারাই অভিশপ্ত। এ জন্যই বুযুর্গানে দীনেরা বলেছেন,

لَيْسَ الْعِيْدُ لِمَنْ لَبِسَ الْجَدِيْدَ، إِنَّمَا الْعِيْدُ لِمَنْ خَافَ الْوَعِيْدَ .

'শুধু নতুন কাপড় পরিধান করলেই ঈদ হয় না, বরং যারা পরকালের শাস্তির ভয়-ভীতির দরুণ আল্লাহর নাফরমানি থেকে বেঁচে রয়েছে তাদের জন্যই প্রকৃত ঈদ।'

لَيْسَ الْعِيْدُ لِمَنْ نَصَبَ الْقُدُوْرَ، إِنَّمَا الْعِيْدُ لِمَنْ عَمِلَ بِالْمَقْدُوْرِ.

'যে খানা-পিনায় লিপ্ত তার জন্য ঈদ নয়, প্রকৃত ঈদ হচ্ছে সেসব লোকের জন্য যারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য কাজ করেছে।'

সুফি মনীষী ও ওলামায়ে উম্মতরা পবিত্র ঈদের দিন সম্পর্কে বলেছেন, يَوْمُ التَّهْنِيَّةِ এবং يَوْمُ التَّعْزِيَّةِ অর্থাৎ যারা রমযানের পবিত্রতা পালন করেছেন তাদের জন্য মুবারকবাদের দিন এবং যারা রমযানের পবিত্রতা রক্ষা করেনি তাদের জন্য চিন্তা ও সমবেদনা প্রকাশের দিন।

সে দিকে লক্ষ করে দেখা যাচ্ছে, ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাযি.) পবিত্র ঈদের দিনে স্বীয় ঘরের দরজা বন্ধ করে কাঁদছিলেন অথচ তাঁর রাষ্ট্রের অন্যান্য সবাই ঈদের আনন্দ ভোগ করছিলেন বিশেষভাবে। উক্ত ঈদের দিনে একজন সাহাবী তাঁর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে, হে আমিরুল মুমিনীন! সকল লোক আজকে একান্তভাবে আনন্দ উপভোগ করছে আর এমন খুশির দিনে আপনি কেন কাঁদছেন? উত্তরে তিন বললেন, যারা আল্লাহর দরবারে পবিত্র রমযানের মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে আল্লাহর মকবুল বান্দাদের তালিকাভুক্ত হয়েছেন তারাই শুধু আনন্দ উপভোগ করবেন আর যারা মকবুলিয়তের লিস্টিভুক্ত হতে পারেনি তাদের ক্রন্দন করা উচিত। আমিত জানি না আমি কি আল্লাহর মকবুল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত, না আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিতদের অন্তর্ভুক্ত।

উল্লিখিত আলোচনার নিরিখে আমরা একথা বলতে চাই যে, মুসলমানদের ঈমান হচ্ছে, আল্লাহর রহমতের আশা এবং ভয়-ভীতির মধ্যখানে। অতএব আমাদের উচিত আমরা যাতে নিজকে এমন আনন্দ ও বিলাসিতায় লিপ্ত না করি যা দ্বারা ইসলামের সীমা লঙ্ঘন হয় ও আল্লাহর অসন্তুষ্টি প্রকাশ পায়। যার পরিণতি হিসেবে পরকালীন শাস্তি অবশ্যাম্ভাবী হয়। তাই মুসলমানদের পবিত্র ঈদের দিনে খুশি ও আনন্দ শরীয়তের সীমার মধ্যে থাকা আবশ্যক।

ঈদের দিনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ৩০ দিন কঠোর সিয়াম সাধনার মাধ্যমে অর্জিত সাফল্য বছরের বাকি ১১ মাস জারি রাখা। অর্থাৎ দৈনন্দিন কাজে-কর্মে, অফিস-আদালতে, লেন-দেন, আচার-ব্যবহারে খারাপ কাজগুলো পরিহার করে ভালো কাজগুলো গ্রহণ করতে হবে। সাথে সাথে রমযানের মহান শিক্ষা খোদাভীতির উজ্জ্বল নিদর্শনস্বরূপ আমাদের সামাজিক ও জাতীয় জীবনে খোদাহীন সকল কর্মপন্থার বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম করে কুরআন ও সুন্নাহর আইন বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এটা প্রত্যেকের ঈমানী দায়িত্ব।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে শরীয়তসম্মত পন্থায় ঈদের খুশি উদযাপনের তওফীক দান করুন। রাসূলে পাক (সা.) ইরশাদ করেছেন,

خَلَقَ اللهُ الْـجَنَّةَ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَغَرَسَ شَجْرَةَ طُوْبَىٰ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَاصْطَفَىٰ جِبْرِيْلَ عليه السلام لِلْوَحْيِ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَالسَّحَرَةُ وَجَدُوْا الْـمَغْفِرَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ.

‘ঈদের দিন আল্লাহ তাআলা বেহেশত সৃষ্টি করেছেন এবং ঈদের দিনেই তুবা নামক বৃক্ষ বেহেশতের মধ্যে রোপন করা হয়েছে। ঈদের দিনই হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে অহী বহন করার জন্য মনোনীত করা হয়েছে এবং এ ঈদের দিনই ফেরাউন পক্ষের যাদুকরগণ হেদায়তের নূরপ্রাপ্ত হয়েছিল।’[১]

---

[১] আল-জিলানী, *আল-গুনয়াতু লি-তালিবায় তরীকিল হক আয্যা ওয়া জাল্লা*, খ. ২, পৃ. ২৯

উপমহাদেশে দীন প্রতিষ্ঠায় ওলামায়ে কেরামের ভূমিকা

উপমহাদেশে পবিত্র দীন ইসলামের প্রচার, প্রতিষ্ঠা ও হেফাজতে ওলামায়ে কেরাম, পীর-মাশায়েখ ও অলি-আল্লাহদের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে অগ্রগণ্য। আজকের বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান মিলে উপমহাদেশ হিসেবে খ্যাত বিশাল ভূখণ্ডকে মুসলিম সেনাপতি ও রাজা-বাদশাহগণ মূর্তিপূজারি আর্যদের কবল থেকে জয় করে অসহায় মানুষকে শতাব্দী কালের জুলুম ও জাহেলিয়াত থেকে মুক্তির পথ করে দিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু ইসলামের প্রচার-প্রসার ও দীন প্রতিষ্ঠায় তাঁদের ভূমিকা মোটেও সন্তোসজনক ছিল না। এমনকি অনেক মুসলিম রাজা-বাদশাহ ভোগ-বিলাসিতা ও দীন ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করে ইসলামের পথ বাধার সৃষ্টি করেছিল। যাদের মধ্যে একজন ছিলেন বিভ্রান্ত দীন-এ-ইলাহীর প্রবর্তক বাদশাহ আকবর। তাই ঐতিহাসিকগণ একথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করেন যে, ভারতীয় উপমহাদেশে দীন ইসলামের প্রচার ও প্রসারে পীর-মাশায়েখ, সুফি দরবেশ ও ওলামায়ে কেরামের ভূমিকাই ছিল মূখ্য।

মূর্তিপূজারি বহুঈশ্বরে বিশ্বাসী হিন্দুস্থানে দীন প্রতিষ্ঠার অগ্রনায়ক ছিলেন হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.)। রাজস্থানের রাজা পৃথিরাজের সকল ষড়যন্ত্রকে নস্যাত করে দিয়ে লা শরীক আল্লাহর একত্ব ও অসীম ক্ষমতার কাছে হিন্দু রাজশক্তির পরাজয়ের ফলে কালিমা তাইয়িবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর আওয়াজ খায়বার থেকে হিমালয়, সিন্ধু থেকে সুরমা পর্যন্ত ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। সেসূত্র ধরে খাজা নিজামউদ্দীন আউলিয়া (রহ.), হযরত খান জাহান আলী (রহ.), হযরত শাহ জালাল (রহ.) হযরত আবু আলী কলন্দর (রহ.), হযরত দাতাগঞ্জে বখশ (রহ.), হযরত শাহ মখদুম (রহ.), মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী (রহ.)সহ বহু

আউলিয়া ও ওলামা উপমহাদেশ বিশেষত বাংলা, আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেন।

আজ থেকে ২৫০শ বছর পূর্বে ব্রিটিশ শাসনের আগে দীর্ঘ ৬ থেকে ৭০০ বছর ভারতবর্ষে একটানা রাজত্ব করেছিলেন মুসলমান রাজা-বাদশাহগণ এবং এদেশের রাষ্ট্র ভাষাও ছিল ফারসি। আমরা জানি একটি দেশ পরিচালনায় যে মৌলিক জিনিসগুলোর প্রয়োজন তাহলো বিচারব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা ও সেনাবাহিনী। ভারতবর্ষেও সেনাবাহিনী সরাসরি বাদশাহগণের অধীনে ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু বিচারব্যবস্থা ও শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত ছিল ওলামায়ে কেরামের হাতে। কারণ তখন ইংরেজি শিক্ষা তো ছিলই না, স্বয়ং ইউরোপই অন্ধকার ও অশিক্ষায় নিমজ্জিত ছিল। ওলামায়ে কেরামের হাতে তৈরি শিক্ষিত লোকেরাই দীর্ঘ ৭০০ বছর পর্যন্ত সমস্ত রাষ্ট্রীয় কাজ চালিয়েছেন। এটা হলো একটা দিক।

অন্যদিকে একমাত্র ওলামা ও পীর-মাশায়েখই এদেশের মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেছেন। তাদের চারিত্রিক মাধুর্য ও আধ্যাত্মিক আকর্ষণে লক্ষ লক্ষ পথহারা মানুষ তওহীদের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিল। তাছাড়া এ ৭০০ বছর ধরে মুসলিম আমীর ওমরা ও রাজা-বাদশাহরা যখন রাজাশাসন ও ব্যক্তিগত ভোগ-বিলাসে মত্ত ছিলেন তখন মুসলিম জনসাধারণের ঈমান-আকীদার সংরক্ষণ, দীনী তালিম ও তরবিয়ত প্রদান এবং ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে অনেক ক্ষেত্রে বাদশাহ ও শাসকবৃন্দের অনৈসলামিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে হক্কানী আলেমগণ শরীয়তের কথা বলে ইষলাম বিরোধী আইন-কানুন রহিত করার জন্য সর্বস্তরের মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করতেন।

সুলতান আলতামাশের যুগে খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.), সুলতান আলাউদ্দীনের যুগে খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রহ.), ফিরোজশাহ তুঘলকের যুগে হযরত নাসিরুদ্দীন মাহমুদ চেরাগে দেহলভী (রহ.), সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে হযরত মুজাদ্দিদে আলফসানী (রহ.) এবং সম্রাট আওরঙ্গজেবের যুগে মোল্লা জয়ুনউদ্দীন (রহ.) ও হযরত খাজা মাসুম (রহ.)-এর নাম উপমহাদেশে দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে তাঁদের সঠিক দিকনির্দেশনার গুরুত্বপূণ ভূমিকা কখনো অস্বীকার করা যাবে না।

১৭৫৭ সালে বাংলার স্বাধীনতা এবং ১৮০৩ সালে সমগ্র উপমহাদেশের স্বাধীনতা ইংরেজদের কাছে পদানত হলে দীন ইসলাম তথা মুসলমানগণ মহাসংকটে পতিত হয়। মুসলিমবিদ্বেষী হিন্দুদের সার্বিক সহযোগিতা নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজশক্তি যখন উপমহাদেশ থেকে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের নাম-নিশানা মুছে ফেলতে তৎপর, ঠিক সে দুর্যোগ মুহূর্তে মুসলমানদের হারানো গৌরব ও স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে এগিয়ে আসেন মৃত্যুঞ্জয়ী আলেমসমাজ। তাঁদের পুরোধা ছিলেন বালাকোটের রক্তাক্ত প্রান্তরে শাহাদতপ্রাপ্ত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নদ্রষ্টা কোটি কোটি মুসলমানের প্রাণপ্রিয় সিপাহসালার হযরত শাহ সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরলভী (রহ.) ও হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.)।

১৮৩১ সালে শিখ ও ইংরেজ শক্তির সাথে সম্মুখসমরে এ দু'বুযুর্গ ব্যক্তির শাহাদাতবরণের পর আজাদী আন্দোলন এগিয়ে নেন মাওলানা সাইয়েদ নাসির উদ্দীন দেহলভী (রহ.)। তাঁর ইন্তেকালের পর দীনী জিহাদের হাল ধরেন মাওলানা আহমদ উল্লাহ (রহ.) ও মাওলানা ইয়াহইয়া (রহ.) প্রমুখ আলেমবৃন্দ। তাঁদেরকে ইংরেজ সরকার কালাপানিয়া তথা আন্দামান দ্বীপে নির্বাসন দেয় এবং তাঁরা সেখানেই (১৮৮১-১৮৮৬ খ্রি.) ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

১৮৫৭ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম উপমহাদেশব্যাপী যে সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয় এর প্রাণপুরুষ ছিলেন আধ্যাত্মিক জগতের মহাসম্রাট হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.)। তাঁর সাথে এ পবিত্র জিহাদে নেতৃত্ব দেন হযরত মাওলানা কাসিম নানুতবী (রহ.), মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী (রহ.) প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম। ১৮৫৭-১৮৬০ পর্যন্ত এ ৩ বছরে ব্রিটিশরাজ স্বাধীনতাকামী মুসলিম সিপাহী ও স্বেচ্ছাসেবক মুসলিম মুজাহিদদের কঠোরভাবে দমনের জন্য অনুন্য ৬০ হাজার নিয়মিত ইংরেজ সৈন্য নিয়োগ করে। অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে মুসলমানদের ওপর গণহত্যা চালিয়ে ইংরেজরা সিপাহী বিপ্লব নস্যাত করে দেয়। ইংরেজ ও হিন্দু জমিদার শ্রেণির বিরুদ্ধে মুসলমানদের এ জিহাদী আন্দোলন ফকীর মজনু শাহ, সৈয়দ মীর নিসার আলী তিতুমীর এবং জানা-অজানা বহু শহীদের রক্তাক্ত শাহাদাতের মাধ্যমে পরিসমাপ্তি ঘটে। এ অবস্থায় ব্রিটিশশক্তির দোর্দণ্ড প্রতাপের মুখে কোণঠাসা মুসলমানদের দীন ও ঈমানের বাতি জ্বালিয়ে রাখার দায়িত্ব নেন ওলামায়ে কেরাম ও পীর-মাশায়েখ।

মসজিদের বারান্দা, মাদরাসার কক্ষ, বড় বাড়ির দেহলিজে এবং পীর-মাশায়েখের খানকা ছিল সর্বস্তরের মুসলমানদের দীন ও ঈমানী রুহানী কেন্দ্র। এ সময় ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পরিবর্তে আদর্শিক সংগ্রামের ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথমে কলিকাতা আলিয়া মাদরাসা ও পরবর্তীতে দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসা। এ দু'প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে দেশের আনাচে-কানাচে গড়ে উঠে অসংখ্য দীনী প্রতিষ্ঠান।

এ পর্যায়ে আলীগড়ের মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সাইয়েদ আহমদ কর্তৃক মুসলিম তরুণদেরকে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি ধাবিত করা মুসলিম জাগরণের জন্য সহায়ক ছিল, না ক্ষতির কারণ ছিল সে বিতর্কে না গিয়েও বলতে পারি যে, তিনিও একজন আলেম ছিলেন এবং শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান ছিল অনন্য। এমনকি তখনকার দিনে শিক্ষিত বলতেই বোঝাতো আরবী ও ফারসি শিক্ষিত লোক। যাই হোক নানা অশিক্ষা, কুসংস্কার ও বিজাতীয় চক্রান্তে মুসলিমসমাজ যখন চরমভাবে বিপর্যস্ত তখন শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.), শাহ আবদুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) ও শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত ওলামায়ে কেরাম ঘুণে ধরা মুসলিম সমাজে ইসলামী সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করেন।

বাংলায় হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও পীর দুদুমিয়া (রহ.)-এর ফরায়েজী আন্দোলন এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। সাথে সাথে ফুরফুরার পীর আলা হযরত আবু বকর সিদ্দীকী (রহ.), শর্ষিনার পীর-মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ (রহ.), শাহ সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর খলীফা নোয়াখালীর মাওলানা ইমামউদ্দীন বাঙ্গালী (রহ.), মিরশ্বরাইয়ের সুফি নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী (রহ.), চুনতীর মাওলানা আবদুর হাকিম (রহ.)-এর দীন ইসলামের খেদমত চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে এ দেশের মুসলমানদের অন্তরে।

খ্রিস্টান মিশনারিদের ইসলামবিদ্বেষী ভূমিকার বিরুদ্ধে যশোরের মুন্সী মেহের উল্লাহর ভূবনখ্যাত যুক্তিপূর্ণ ভাষণ বহু পথহারা মুসলমানকে পথের দিশা দিয়েছে। অনেক খ্রিস্টানকে মুসলমান হতে উদ্বুদ্ধ করেছে। আমরা একথা জোর দিয়ে বলতে পারি যে, উপমহাদেশে প্রায় ২০০ বছর ধরে ব্রিটিশ শাসনামলে ইংরেজ ও হিন্দুদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের চতুর্মূখী হামলার মাঝেও মুসলমানদের ঈমান-আকীদার হেফাজত ও ইসলামী জাগরণে বীর মুজাহিদের ভূমিকা পালন

করেছেন আল্লাহর দীনের জন্য নিবেদিত প্রাণ অকুতোভয় ওলামায়ে কেরাম ও পীর-মাশায়েখ।

মাত্র ৪০ বছর পূর্বে উপমহাদেশের আজাদী আন্দোলন তথা মুসলমানদের হারানো গৌরব ফিরে পাওয়ার সংগ্রামে ওলামায়ে কেরামের ভূমিকা স্মরণযোগ্য। মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামবাদী, মাওলানা আকরম খাঁ, মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী ভ্রাতৃদ্বয় এবং মাওলানা আবুল কালাম আজাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাংবাদিকতা ও রাজনৈতিক অবদান দীন ইসলামের প্রতিষ্ঠার কাজে আমাদের যুগ যুগ ধরে অনুপ্রাণিত করবে।

যুগে যুগে পীর-মাশায়েখের অনন্য অবদান

খুলাফায়ে রাশিদীনের পর ইসলামী বিশ্ব মহাসঙ্কটে পতিত হয়। উমাইয়া এবং আব্বাসীয় খলীফাদের দ্বন্দ্ব-কলহে ইসলামী বিশ্বে মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতি দিন-দিন লোপ পেতে থাকে। ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের সন্ধানে চির ধরার ফলে নৈতিক মনোবল হারিয়ে তাদের মধ্যে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। পরবর্তী যুগে এ সুযোগে উত্তর সীমান্তে খ্রিস্টানদের আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। অপর দিকে ইরানি ও তুর্কিগণ স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েমের চেষ্টা করতে থাকে। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের চতুর্দিকে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে যায়। একইভাবে প্রাচীন ইরানি ও ভারতীয় অনৈসলামিক চিন্তাধারা ও জীবনাদর্শ ইসলামী জগতে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। এর ফলে ইসলামের পূত-পবিত্র ভাবধারা ও শিক্ষার প্রণালী পরিবর্তিত হতে থাকে। বহু স্থানে ইসলামের তাহযীব-তামাদ্দুন বিরোধী চিন্তাধারার বন্যা ভেসে যায়। ইতিমধ্যে মিসর, সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের ওপর নগ্ন হামলা চালানো হয়। সুবাইলী নামক এ যুদ্ধ বছরের পর বছর চলতে থাকে। এক শতাব্দী পর্যন্ত অবিরাম আপ্রাণ চেষ্টার পর মুসলমানগণ উক্ত বিপদ হতে রক্ষা পায়। কিন্তু এর পরপরই এশিয়া তাতারিরা আবার মুসলিম রাষ্ট্রে হামলা শুরু করে। তাদের বর্বর আক্রমণে মুসলিমসভ্যতার প্রাণকেন্দ্রসমূহ জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যায়।

ইসলামের বাহ্যিক-অভ্যন্তরীণ এমন দুর্যোগের সময় সত্যিকার ইসলাম রক্ষা করার ব্যাপারে সুফিয়ায়ে কেরামের দান ছিল সর্বাধিক। রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপদে যখন ইসলাম প্রায় লুপ্ত হওয়ার অবস্থা তখনও আল্লাহর খাস রহমেত ইসলাম রক্ষা পায়। এখন কথা হচ্ছে কোন অপ্রতিরোধ্য শক্তি বলে শতাব্দীর পর শতাব্দী দুর্যোগের মধ্যেও ইসলাম বেঁচে রইল? কি সেই গোপনশক্তি যার দ্বারা ইসলাম সকল দুশমন ও

ধ্বংসকারীদের হীনষড়যন্ত্র ও অত্যাচারের মধ্যে সাবলীলভাবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখল? এর উত্তরে আমরা বলল, একমাত্র হক্কানী ওলামা ও সুফিয়ায়ে কেরামের সাধনা ও ত্যাগের বদৌলতেই তা সম্ভব হয়েছিল। তাঁরা নিজের বুর্যুগি বা আধ্যাত্মিক শক্তি, মহান চরিত্র ও মহানুভবতা, ইলম ও নেক আমলের দ্বারা ইসলামী তাহযীবকে জীবন্ত ও সাবলীল রাখতে সামর্থ হয়েছিলেন।

মুসলিম জগতে যখন চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় তখন সত্যিকার মুসলমান হিসেবে জীবন যাপন সাধারণের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রের শাসকগণ বেপরোয়া এবং দায়িত্বহীন মানুষের ন্যায় আরাম-আয়েশের মধ্যে গা ভাসিয়ে দেয়। আলেম ও শিক্ষিতসমাজের মধ্যে মতানৈক্য চরমে পৌঁছে। এ কারণে সাধারণ মানুষ খাঁটি দীনের পথ খুঁজতে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। আমীর-বাদশাহগণের আচার-আচারণ এবং ধর্মীয় রীতি-নীতি ছিল ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত। এ অবস্থায় পবিত্র দীন ইসলামকে দোষমুক্ত রাখার জন্য সুফিয়ায়ে কেরাম সক্রিয় হয়ে উঠেন। তাঁরা মসজিদ ও খানকাগুলোতে ইসলামী তাহযীবের শিক্ষাকে বাহ্যিক হামলা হতে রক্ষা করে দীনী খেদমতের জন্য আত্মনিয়োগ করেন। তাই সে যুগে উক্ত স্থানসমূহ দীনী ইলম প্রচার ও প্রসারকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। যুগে যুগে সেখানেই তাঁদের শত সহস্র-মুরীদ ও ভক্তবৃন্দ শরীত ও তরীকতের খাঁটি শিক্ষা লাভ করেছেন।

এখন সকলের চিন্তা করা উচিত যে, যখন মুসলিম দেশসমূহে সত্যিকার ইসলাম রাষ্ট্রীয়ভাবে কায়েম ছিল না এবং মুসলমানরা বিদেশি শক্তির গোলামে পরিণত হয়েছিল। জালেম ও অন্ধ লোক দ্বারা দেশ শাসন করা হতো, বিধর্মী এবং বিদেশি শক্তির আক্রমণের ভয়ে মুসলমানদের সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকতে হতো তখন যদি পীর-বুযুর্গগণ তাঁদের মসজিদ, খানকা ও দরবারে দীনী হেদায়তের বাতি জ্বেলে না রাখতেন তবে মুসলমানদের কি অবস্থা হতো? ইসলামের ইতিহাস এসব দুর্যোগপূর্ণ সময়ে মুসলমানদের সত্যিকার দীন ইসলামের বহুল প্রচলন শুরু হয়।

নিঃসন্দেহ যে, ইসলামী সুফিবাদ ও অনৈসলামী দর্শনের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। মুসলমান সুফিয়ায়ে কেরাম কেবল নিজেদের আত্মপরিশুদ্ধ করেই ক্ষান্ত হননি, বরং পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বিতর্কিত মাসআলা-মাসায়েলের সংশোধন সাধনেও তাঁরা সক্রিয় ছিলেন। তাঁদের মধ্যে দীনী ইলম হাসিলের জন্য দুটি শর্ত ছিল, একটি আল্লাহর দীন সম্বন্ধে সত্যিকার জ্ঞান অর্জন এবং অন্যটি রাসূল (সা.)-এর

সুন্নাতের অনুসরণ। তাই তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই দুনিয়াদারী ত্যাগ করার বিরোধী ছিলেন। যদিও কিছুসংখ্যক সুফিয়ায়ে কেরাম আত্মশুদ্ধির জন্য দুনিয়াদারির ঝামেলা ত্যাগ করে নিজদেরকে খানকার মধ্যে আবদ্ধ রেখে ছিলেন। তবুও এমন একদল পীর-বুযুর্গ সবসময় ছিলেন যাঁরা সুফি মতবাদকে শরীয়তসম্মত রাখতে এবং তার সাথে জাগতিক বিষয়াদির যোগাযোগ স্থাপন করতে সচেষ্ট হতেন। নিজ মুরীদগণের জাহেরী ও বাতেনী ইসলাহ বা সংশোধনের সাথে সাথে সমকালীন রাজা-বাদশাহগণের চেয়েও তাঁরা মুসলিম জাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিশেষ করে ভারতের মুসলিম শাসনামলে এর অনেক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আছে। এ সময়ে ওলামায়ে কেরাম রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের মুহাফেয (রক্ষাকারী) ছিলেন। সম্রাট তথা শাসকগণ দেশরক্ষা এবং এর শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতেন, আওলিয়া ও সুফিয়ায়ে কেরাম মানুষকে তালীম-তরবিয়ত প্রদান এবং ইসলামী তাহাযীব-তামাদ্দুনের প্রচার করতেন। তাই তাঁরা সর্বপর্যায়ের মুসলমানদের অন্তরে শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বাদশাহ ও আমীরগণ রাষ্ট্রীয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পীর-বুযুর্গের প্রয়োজনীয় উপদেশাবলি গ্রহণ করতেন। আবার আমীর-ওমরার কোনো ইসলামবিরোধী আইনের বা কাজের বিরুদ্ধে তাঁরা প্রতিবাদ করে সমাধান দিতেন এবং জনগণকে ইসলামবিরোধীদের প্রতিহত করার আহ্বান জানাইতেন। যেমন– সুলতান আলতামাশের যুগে হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.), সুলতান আলাউদ্দীনের যুগের হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রহ.), ফিরোজ শাহ তোঘলকের যুগে হযরত নাসিরুদ্দীন মাহমুদ চেরাগে দেহলভী (রহ.), সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে হযরত মুজাদ্দিদে আলফসানী (রহ.) এবং সম্রাট আওরঙ্গযেবের যুগে হযরত মোল্লা জীয়ুন (রহ.) ও হযরত মির্জা মাসুম (রহ.)-এর নাম ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। রাষ্ট্রপরিচালনার ব্যাপারে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কখনো অস্বীকার করা যাবে না।

সেই মহিমান্বিত বুযুর্গ মুজাহিদদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এখনও বাংলাদেশসহ সমগ্র ইসলামী দুনিয়ায় হক্কানী রব্বানী আলেম, পীর-মাশায়েখ অত্যাচারী রাষ্ট্রনায়ক, খোদাদ্রোহী শক্তি এবং যাবতীয় অনৈসলামী কাজের বিরুদ্ধে তাঁদের ঐতিহাসিক বিপ্লবী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। সেই সিলসিলা ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে।

তাসাওউফের উৎপত্তি

ইলমে তাসাওউফের উৎপত্তি সম্পর্কে দার্শনিক ও চিন্তাবিদগণ যেসব মন্তব্য করেছেন নিম্নে প্রদত্ত হলো:

আবু যায়েদ আবদুর রহমান ইবনে খালদুন (রহ.) 'সুফি' নামকরণের ব্যাখ্যায় বলেছেন,

> *'বিলাসপ্রবণ ও আড়ম্বরপূর্ণ পোষাকে অভ্যস্ত লোকদের থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্যে সুফিরা পশমী পোষাক পরিধান করতেন।'*[১]

সুতরাং সুফি বলতে দরবেশসূলভ পশমী পোষাক পরিহিত লোকদেরকে বোঝায়। কেননা সূফ মানে পশম। কারো মতে,

> *'যারা সুন্দরতম চরিত্রের দ্বারা স্বীয় জীবনকে সুশোভিত করেছেন এবং কু-স্বভাবসমূহ পরিহার করেছেন প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই হচ্ছেন সুফি। কেননা সুফি মানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এ কারণেই তাঁদেরকে সুফি হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। কেননা আস-সফ মানে পরিচ্ছন্নতা।*[২]

কেউ কেউ বলেছেন যে,

> *'এটি আসহাবুস সুফ্ফা থেকে বর্ণিত। তাঁরা হচ্ছেন এমন কতিপয় সাহাবায়ে কেরাম যাঁরা মসজিদে নববীতে সবসময় আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও দীনী ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে মশগুল থাকতেন। যাঁদের প্রশংসনীয় উদ্যোগের কথা মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র কালামে উল্লেখ করে ইরশাদ ফরমায়েছেন। যাঁরা সকাল-বিকাল (যিক্র-আযকারের মাধ্যমে) তাঁদের রবকে ডাকেন, তাঁরা সান্নিধ্য*

---

[১] ইবনে খলদুন, ***তারীখু ইবনি খলদুন***, খ. ১, পৃ. ৬১১

[২] আবদুল কাদির ঈসা, ***হাকায়িকুন আনিত তাসাওউফ***, পৃ. ২০

অবলম্বন করুন। আদতে সুফ্ফা হল মসজিদে নববীর আচ্ছাদিত অংশ যেখানে তারা বসবাস করতেন।'[১]

কেউ কেউ বলেছেন,

'এটি আস-সফ থেকে উদ্ভূত। এ জন্য যে সুফিরা মুসলিম উম্মহার প্রথম কাতারের লোক। কেননা তাঁরা কলবের সফায়ীর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্য লাভে ও সকল প্রকার ইবাদত-বন্দেগিতে অন্যান্যদের থেকে অধিক অগ্রগামী।'[২]

মোটকথা ইলমে তাসাওউফ ইসলামী জগতে এমন স্বীকৃতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, এর উৎপত্তি ও পরিচয়ের আলোচনা আজ আর তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। অবশ্য কেউ কেউ তাসাওউফকে এ মর্মে অস্বীকার করার পাঁয়তারা করেছেন যে, এটি সাহাবা ও তাবেয়ীনদের জমানায় শোনা যায়নি। অতএব এটি গ্রহণযোগ্য নয়। এর উত্তরে আমরা বলব, সাহাবায়ে কেরামের পর দীন ইসলামের যেসব বিভিন্ন বিষয় উদ্ঘাটিত হয়েছে তার মধ্যে এটিও উদ্ঘাটিত ও প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি কেউ এটি অস্বীকার করেননি এবং এর বিরুদ্ধে কোনো আপত্তিও উঠাননি। যেমন– ইলমে ফিকাহ, ইলমে নাহু ও ইলমে মানতিক ইত্যাদি। অনুরূপভাবে ইলমে তাসাওউফও।

এর শব্দতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আমাদের উদ্দেশ্য নয়, বরং আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাসাওউফের হাকীকত ও মূলনীতি। আমরা লোকদেরকে শুধু সে দিকেই দাওয়াত দিচ্ছি যার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মার পরিশুদ্ধি, অন্তরের পরিচ্ছন্নতা, চরিত্রের সংশোধন সর্বোপরি ইহসানের অর্থাৎ আধ্যাত্মিক মর্যাদার সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হওয়া। আর এটিকেই আমরা তাসাওউফ নামকরণ করি। ইসলাম হচ্ছে আনুগত্য এবং ইবাদতের নাম, ঈমান হচ্ছে আলো এবং প্রত্যয়ের নাম, ইহসান হচ্ছে মুরাকবা ও মুশাহাদার স্থান, যার মর্ম হলো:

«أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ».

'তুমি এমনভাবে আল্লাহ তাআলার ইবাদত কর যাতে তুমি তাঁকে দেখছ, যদি সে স্থানে পৌঁছতে না পার তাহলে তুমি বিশ্বাস রাখ যে, আল্লাহ তোমাকে দেখছেন।'[৩]

---

[১] আবদুল কাদির ঈসা, ***হাকায়িকুন আনিত তাসাওউফ***, পৃ. ২০

[২] আবদুল কাদির ঈসা, ***হাকায়িকুন আনিত তাসাওউফ***, পৃ. ২১

[৩] আল-বুখারী, ***আস-সহীহ***, খ. ১, পৃ. ১৯, হাদীস: ৫০, হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত

সাইয়েদ মুহাম্মদ সিদ্দিক আল-গুমারী (রহ.) তাঁর নিজ *রিসালায়* বলেছেন,

> *'এ হাদীসে যে ৩টি আরকানের উল্লেখ রয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তির এর একটিতে ত্রুটি থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে তার দীন অপূর্ণাঙ্গ। কেননা সে ইসলামের একটি রোকনকে ছেড়ে দিয়েছে। ঈমান ও ইসলামের পরিশুদ্ধির পরে তরীকত মানুষকে যে চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে আহ্বান করে তা হচ্ছে মকামে ইহসান। যদিও বিভিন্ন ব্যক্তি তার ভিন্ন-ভিন্ন নামকরণ করেছেন। তবুও ওলামায়ে কেরাম তাসাওউফের নামকরণ ও এর হাকীকত সম্পর্কে পূর্ববর্তী মুরশিদগণের উত্তরাধিকার লাভ করেছেন। এটি ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে অদ্যাবধি প্রচলিত রয়েছে। অতঃপর এ নামেই এটি পরিচিতি লাভ করেছে।'*[১]

ড. আহমদ আলূশ, ইসলামের প্রাথমিক যুগে সুফিবাদের প্রচার না হওয়ার পেছনে কি কারণ ছিল সে প্রসঙ্গে অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। এর উত্তরে বলা যায় যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে এর তেমন একটা প্রয়োজন ছিল না। কেননা সে যুগে ঈমানদারগণ অধিক তাকওয়াসম্পন্ন পরহেযগার ছিলেন এবং দীনের জন্য অধিক কষ্ট স্বীকার করতেন। এমনকি ইবাদত-বন্দেগি তাঁদের স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। সর্বোপরি তাঁরা নবী করীম (সা.)-এর অনুকরণ ও অনুসরণে একে অপরের অগ্রগামী ছিলেন। উক্ত সময়ে অন্য কোনো জ্ঞানের মাধ্যমে তাঁদের কাজ-কর্মে উৎসাহিত করা বা পথপ্রদর্শনের প্রয়োজন ছিল না।

পরবর্তী সময়ে যখন বিভিন্ন বিজাতীয় সংস্কৃতি এবং ভ্রান্ত মতবাদ ইসলামের মধ্যে অনুপ্রবেশ করল তখন ইসলামের সঠিক জ্ঞান ও নিয়ম-কানুন রক্ষার্থে, যুগের চাহিদা অনুযায়ী সুফিয়ায়ে কেরাম শরীয়তসম্মত নিয়ম পদ্ধতি অনুসরণ এবং ইসলামের সীমারেখা বজায় রেখে তরীকতের পন্থা অবলম্বন করেন। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ যদিও নামে সুফি আখ্যায়িত ছিলেন না, তবুও কর্মের দিক দিয়ে তাঁরা সুফি ছিলেন।

তাসাওউফের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে স্বীয় জীবন যাপন করা। একনিষ্ঠভাবে ইবাদত-বন্দেগিতে আত্মনিয়োগ করা ও সর্বোপরি রুহ ও কলব দিয়ে আল্লাহ তাআলার বন্দেগিতে সর্বাদা রত থাকা।

---

[১] (ক) আবদুল কাদির ঈসা, ***হাকায়িকুন আনিত তাসাওউফ***, পৃ. ২৪–২৫; (খ) মুহাম্মদ সিদ্দীক আল-গুমারী, ***আল-ইনতিসারু লি তরীকিস সুফিয়া***, দারুত তা'লীফ, কায়রো, মিসর, পৃ. ৬

আমরা দেখতে পাই যে, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীরা সকল প্রকার কামালিয়াত প্রাপ্তির মাধ্যমে সর্বোচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম শুধু ঈমানের আকায়েদের ওপর বিশ্বাসী ছিলেন না এবং তাঁরা শুধু ফরযগুলো আদায় করতেন না, বরং তাঁরা ঈমানের স্বাদ ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য ফরযগুলোর পরেও নফল ইবাদত ইত্যাদি যা রাসূলে করীম (সা.) পছন্দ করতেন সবগুলো আদায় করতেন।

হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া তো দূরের কথা, মাকরুহ কার্যাবলি থেকেও তাঁরা দূরে সরে থাকতেন। তাঁদের অন্তদৃষ্টি খুলে গিয়েছিল এবং তাঁদের অন্তর থেকে দীনের সূক্ষ্মজ্ঞান প্রবাহিত হত এবং তাঁদের সর্বাঙ্গে আসরারে রব্বানী (খোদায়ী গোপন রহস্যসমূহ) জারি হত। এমনি অবস্থা তাবেয়ীন ও তবে-তাবেয়ীনের ছিল। এ তিন যুগ ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ। মহানবী (সা.) ইরশাদ ফরমায়েছেন,

«خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِيْ هَذَا، فَالَّذِيْ يَلِيْهِ وَالَّذِيْ يَلِيْهِ».

'সবচেয়ে উত্তম যুগ আমার যুগ, অতঃপর এর পরবর্তী যুগ এবং এরপর তার পরবর্তী যুগ।'[১]

সুফি মতবাদের উৎপত্তি সম্পর্কে ইবনে খালদুন (রহ.) বলেছেন,

'সুফি মতবাদ ইসলামে উদ্ভূত ধর্মীয় ও বিজ্ঞানের একটি অন্যতম বিষয়। সাহাবা, তাবেয়ীন, তবে তাবেয়ীন এবং তাঁদের পরবর্তী যুগের সুফিদের অনুসৃত পথকেই মুসলমানরা সত্যিকার নাজাতের ওপর পথ বলে বিশ্বাস করতেন। ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার প্রতি অনুরক্ত হওয়া, আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর প্রতি ভালবাসা, জাগতিক লোভ-লালসা পরিহার, আড়ম্বরপূর্ণ জীবন-যাপন ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা, জীবনের আকাঙ্ক্ষিত বিষয়, মান-সম্মানও ধন-সম্পদের ভালবাসা, আনন্দ-উল্লাস ও ক্ষমতা লাভের লিপ্সা এবং জাগতিক মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে আল্লাহর প্রেমময় দাসত্বে আত্মসমর্পিত হয়ে নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন হচ্ছে সুফি মতবাদের মূলনীতি। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন সুফিদের মনে কিছু পার্থিব লোভ-লালসা অনুপ্রবেশ করতে শুরু করে এবং জাগতিক পঙ্কিলতা ও কলুষতা থেকে সুফিগণ আত্মসংযম করতে অক্ষম হন তখন যাঁরা কেবল

---

[১] (ক) আবদুল কাদির ঈসা, *হাকায়িকুন আনিত তাসাওউফ*, পৃ. ২৫; (খ) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৩, পৃ. ১৭১, হাদীস: ২৬৫১; (গ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৯৬৪, হাদীস: ২৫৩৫:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «خَيْرُكُمْ قَرْنِيْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ».

ধর্মীয় বিধানকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে বরণ করে নিয়েছিলেন, তাঁরাই মুতাসাওউফিয়া নামে পরিচিত হন।'[১]

যেমন– ইবনে খালদুন (রহ.) তাঁর মুকদ্দমায় বলেন,

'এ ইলমটি অর্থাৎ তাসাওউফ ইসলামী সমাজের জাতীয় চত্বরে উদ্ভূত শরয়ী বিধানগুলোর মধ্যে একটি। যাঁরা তাসাওউফের ধারক ও বাহক তাঁদের নিয়ম পদ্ধতি সলফে সালেহীন (পূণ্যবান প্রাথমিক যুগের উম্মত) জলীলুল কদর সাহাবা, তাবেয়ীন এবং তাঁদের অনুসারীদেরই সঠিক ও হেদায়তের পথ। এর মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগির ওপর সুদৃঢ় থাকা, একমাত্র আল্লাহ তাআলার সাথে একাত্ম হয়ে যাওয়া এবং দুনিয়াবি সৌন্দর্য ও জাঁকজমক ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা।'[২]

তাসাওউফের ইতিহাস সম্পর্কে হাফেজ সইয়েদ মুহাম্মদ সিদ্দীক আল-গুমারী (রহ.) থেকে এ মর্মে জিজ্ঞেস করা হয় যে, সর্বপ্রথম তাসাওউফের ভিত্তিপ্রস্তর কে স্থাপন করেছেন? এটা কি আসমানি অহী? উত্তরে তিনি বলেন,

'দীনে মুহাম্মদীই হচ্ছে এর ভিত্তি। এক কথায় আসমানি অহী হচ্ছে এর ভিত্তি। নিঃসন্দেহে এটি মকামে ইহসান যা দীনের ৩টি রোকনের (স্তরের) একটি। নবী করীম (সা.) এক এক করে দীনের বর্ণনা করেছেন,

«هَذَا جِبْرِيْلُ ﷺ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ»

'জিবরীল (আ.) আমার নিকট এসে তোমাদের দীন শিক্ষা দিতে বলেছেন।'[৩]

এ দীনই হচ্ছে ইসলাম, ঈমান ও ইহসান।'[৪]

---

[১] ইবনে খলদুন, ***তারীখু ইবনি খলদুন***, খ. ১, পৃ. ৬১১

[২] ইবনে খলদুন, ***তারীখু ইবনি খলদুন***, খ. ১, পৃ. ৬১১

[৩] আল-বুখারী, ***আস-সহীহ***, খ. ১, পৃ. ১৯, হাদীস: ৫০, হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত

[৪] (ক) আবদুল কাদির ঈসা, ***হাকায়িকুন আনিত তাসাওউফ***, পৃ. ২৪; (খ) মুহাম্মদ সিদ্দীক আল-গুমারী, ***আল-ইনতিসারু লি তরীকিস সুফিয়া***, পৃ. ৬

নামায সব ইবদাতের শ্রেষ্ঠ ইবাদত

নামায সব ইবাদতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইবাদত হওয়ার পেছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে। যথা–

১. প্রথমত নামাযরত অবস্থায় কোনো পার্থিব কাজ করা যায় না। কেননা নামাযের মধ্যে সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ওপর পুরো নিয়ন্ত্রণ থাকে। অপরাপর ইবাদতের মধ্যে পার্থিব কাজও হয়ে থাকে। হজের মধ্যে ব্যবসা, রোযার মধ্যে পার্থিব কাজ কর্মও হয়। অতএব নামাযের মধ্যে ইখলাস বেশি। তাইতো পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ

'নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল এবং গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে।'[১]

২. দ্বিতীয়ত নামায সমগ্র জাহেরী (প্রত্যক্ষ) এবং বাতেনী (পরোক্ষ) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা আদায় করা হয়। নামায হচ্ছে প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ইবাদত।

৩. তৃতীয়ত নামায সকল ফেরেশতার ইবাদতের সমন্বয়। কোনো কোনো ফেরেশতা রুকুর মধ্যে, কোনো কোনো ফেরেশতা কিয়ামের মধ্যে আবার কোন কোন ফেরেশতা সিজদার মধ্যে রয়েছেন।

৪. চতুর্থত নামায আল্লাহ তাআলার সকল মাখলুকের ইবাদতের সমন্বয়। গাছ দণ্ডায়মান অবস্থায় আছে, চতুষ্পদ জন্তুসমূহ রুকু অবস্থায়, কীট-পতঙ্গ সিজদারত অবস্থায়, ব্যাঙ ইত্যাদি বৈঠকরত অবস্থায়। অতএব নামায আদায়কারী ব্যক্তির মধ্যে ফেরেশতা এবং সমগ্র সৃষ্টিকুলের ইবাদতের সমন্বয় ঘটেছে।

---

[১] আল-কুরআন, *সুরা আল-আনকাবুত*, ২৯:৪৫

৫. পঞ্চমত নামায সকলের ওপর ফরয। যাকাত এবং হজ গরীবের ওপর ফরয নয় এবং রোযা মুসাফিরের ওপর ফরয নয়। অতএব নামায সব শ্রেণির লোকের ইবাদত।

৬. ষষ্ঠত নামায দৈনন্দিন আদায় করা হয়। রোযা ও যাকাত বছরে একবার এবং হজ জীবনে একবার আদায় করা ফরয।

৭. সপ্তমত নামায মানুষের জীবনকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করে। নামাযী ব্যক্তির শরীর ও কাপড় সবসময় পবিত্র রাখা প্রয়োজন এবং দিবরাত্রি সবসময় নামাযের চিন্তা থাকতে হয়। অতএব নামায আদায়কারী প্রত্যেক সময় ইবাদতের মধ্যে থাকে, ইবাদতের চিন্তা ও ইবাদত।

নামায ৫ ওয়াক্ত এ জন্য যে, হজুর পাক (সা.)-এর মিরাজের মধ্যে প্রথম ৫০ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়েছিল। এর মধ্যে ৪৫ ওয়াক্ত নামায মাফ করে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলার কাজের নেকীর বদলা ১০ গুণ। তাইতো তিনি স্বয়ং ইরশাদ করেছেন,

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۚ

‘যে ব্যক্তি একটি সওয়াবের কাজ করবে, তার জন্য এর দশগুণ বদলা রয়েছে।’[১]

অতএব নামায পড়ার বেলায় ৫ ওয়াক্ত হলেও সওয়াবের ক্ষেত্রে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান। ৫ ওয়াক্ত নামাযের সময় এজন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, মুমিন ব্যক্তির প্রত্যেক অবস্থা আল্লাহর যিক্‌রের মাধ্যমে আরম্ভ হওয়া প্রয়োজন। যার সূচনা ভালো আশা করা যায় তার সমাপ্তিও একই রকম হওয়া স্বাভাবিক। এজন্য শিশু জন্মগ্রহণ করলে তার কানে আযান দেয়া হয়। জন্ম একটা জীবনের সূচনা। যেহেতু ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মানুষের ৫ অবস্থা হয়। সকাল বেলা দিনের সূচনা। মনে হয় যেন নতুন জীবনের সূচনা, তাই প্রথমে ফজরের নামায পড়বে। যোহরের সময় খাওয়া-দাওয়া এবং আরাম ও অবকাশের সময় দিনের দ্বিতীয় অংশের সূচনা। তাই এ সময় যোহরের নামায পড়বে। আসরের সময় কর্মচারীরা তাদের কাজকর্ম শেষে অবকাশ নেয়, ভ্রমণে বের হয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে অবকাশের সময় এসে যায়। তাই এ অবস্থায় নামায আদায় করা বাঞ্ছনীয়। মাগরিবের সময় রাতের সূচনা।

---

[১] আল-কুরআন, *সুরা আল-আনআম*, ৬:১৬০

তাই এ সময় নামায আদায় করা কর্তব্য। ইশার সময় জাগরণের সমাপ্তিকালীন সময়। ঘুম যা এক ধরনের মৃত্যু। এর সূচনা হওয়ার সাথে সাথে নামায পড়ে শয়ন করবে। মনে হয় যেন এটাই শেষ নিদ্রা। এরপর কিয়ামতের সময় জাগরিত হবে।

আমরা জানি বিজ্ঞ চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্রে ওষুধের ধরণও ভিন্ন-ভিন্ন হয়। নামায ও ভিন্ন ভিন্ন ওষুধের ন্যায়। যে তালার মধ্যে ৩ দাঁতবিশিষ্ট চাবির প্রয়োজন, তা ৪ দাঁতবিশিষ্ট চাবি দ্বারা খোলা যাবে না। এ নামাযসমূহ বিভিন্ন পয়গাম্বরের স্মারক। হযরত আদম (আ.) পৃথিবীতে এসে রাত দেখতে পেলেন এবং ভয় পেয়ে গেলেন। সকাল হওয়ার সাথে সাথে শোকরানাস্বরূপ দু'রাকাআত নামায আদায় করেন। এটি হচ্ছে ফজরের নামায। হযরত ইবরাহীম (আ.) প্রিয় ছেলের কুরবানীর পরিবর্তে দুম্বা পেয়েছিলেন। ছেলের প্রাণ বেঁচে যাওয়ায় এবং কুরবানী আল্লাহর দরবারে গ্রহণীয় হওয়ায় ৪ রাকাআত শোকরানা নামায আদায় করেন। এটি হচ্ছে যোহরের নামায। হযরত উযাইর (আ.) ১০০ বছর পর জীবিত হয়ে ৪ রাকাআত শোকরানা নামায পড়েন, এটি হচ্ছে আসরের নামায। কেননা তিনি ওই সময় জীবিত হয়েছিলেন। হযরত দাউদ (আ.)-এর তওবা কবুল হওয়াতে শোকরানা হিসেবে সূর্য অস্ত যাওয়ার পরে ৪ রাকাআত নামাযের নিয়ত করেছেন, কিন্তু তিনি ৩ রাকাআত আদায় করে থেমে গেছেন, এটা মাগরিবের নামায। আমাদের প্রিয় নবী (সা.) ইশার নামায আদায় করেছেন।

সফরের মধ্যে এ জন্য কসর পড়া হয় যে, মিরাজের সফরে নামায দু'রাকাআত ফরয হয়েছিল। কোনো নামায পরবর্তী সময় বর্ধিত করা হয়েছে। যখন তোমরা সফর করবে, তখন মিরাজের সফরের কথা স্মরণ করবে। এজন্য পরবর্তী দু'রাকাআত কিরাআত ফরয নয় এবং ইমাম এতে আস্তে আস্তে কিরাআত পড়তে থাকেন যাতে একথা স্মরণ থাকে যে, পূর্ববর্তী দু'রাকাআত প্রথমে ফরয হয়েছিল এবং পরবর্তীতে দু'রাকাআত বাড়ানো হয়েছে। যেহেতু তিনের অর্ধেক সঠিক হয় না, এজন্য এতে কসরও হয় না।

কিরাআত আস্তে পড়া হয় এজন্য যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে কাফিরদের আধিক্য ছিল। এরা কুরআন তিলাওয়াত শুনে আল্লাহ তাআলা, হযরত জিবরীল (আ.) এবং হুযুর পাক (সা.)-এর শানে বিদ্রূপ করত। যোহর ও আসরের নামাযের সময় এরা ঘুরাফেরা করে থাকে। মাগরিবের সময় খাওয়া-দাওয়ায় লিপ্ত থাকে। ইশার সময় শুয়ে পড়ে এবং ফজরের সময়

নিদ্রাবিভূত থাকে। এ কারণে যোহর ও আসরের নামায আস্তে আস্তে কুরআন পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١١٠﴾

'অত বড় করে কুরআন পড় না যাতে শব্দ বাইরে যায় এবং অত আস্তে পড় না যাতে নিজে নিজে শুনতে পায়।'[১]

এখন যদিও সে অবস্থা নেই, কিন্তু হুকুম এখনো বহাল রয়েছে। মুসলমানেরা সেই দুর্দিনের কথা স্বীকার করে বর্তমানের কথা স্মরণ রেখে মহান রাব্বুল আলামীনের শোকরিয়া আদায় করেন। নামাযের মধ্যে ৪টা জিনিস পড়া হয় এবং ৪টা কাজ করা হয়। যেমন– কুরআন তিলাওয়াত, তাসবীহ, দরুদ ও দুআ পড়া হয় এবং কিয়াম, রুকু, সিজদা ও কয়ুদ (বসা) ইত্যাদি কার্যাদি করা হয়। এ ৪টি কাজে দুটো হিকমত রয়েছে। যথা–

১. প্রথমত মানুষের চারটি বৈশিষ্ট রয়েছে। যেমন– ১. জড়তা, ২. সজীবতা, ৩. পশুত্ব ও ৪. মানবতা। জড়-পদার্থের ইবাদত হচ্ছে বৈঠকরত অবস্থায়, পশুর ইবাদত হচ্ছে রুকু অবস্থায়, সজীব পদার্থের ইবাদত হচ্ছে সিজদা অবস্থায়, মানুষের ইবাদত হচ্ছে দাঁড়িয়ে। যেভাবে পবিত্র কুরআন দ্বারা সাবিত (প্রমাণ) রয়েছে। অতএব নামাযের মধ্যে এ ৪ ধরণের ইবাদত একত্রিত করা হয়েছে। সর্বোপরি এ ৪টির অভাবে মানুষ আল্লাহ তাআলা থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণ হয়। যারা নামায কায়েম করবে না মনে হচ্ছে যেন মানুষ চার স্তর নীচে অবতরণ করেছে। তাই তার উন্নতির জন্য চারটি কাজ নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

২. দ্বিতীয়ত আগুন, পানি, মাটি ও বাতাসের সঠিক সমন্বয়ে মানুষ। আগুনের বৈশিষ্ট্য গর্ব ও অহমিকা, এজন্য তা উপরের দিকে উত্থিত হয়। দেখুন শয়তান হযরত আদম (আ.)-এর সামনে ঝুঁকেনি। পানির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রসারিত হওয়া। মাটির প্রভাব হচ্ছে জড়তা এবং অবচেতনতা, বাতাসের প্রভাব প্রীতিসুলভ, এজন্য শক্তিশালী ওষুধে বাতাস মিশ্রিত হয়। মনে হয় যেন মানুষ এ ৪টি স্বতন্ত্র বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত। মানুষের মধ্যেও এ ৪টি দোষ বিদ্যমান। এগুলো দূরিভূত করার জন্য এ ৪টি আরকান নামাযের মধ্যে জরুরি বিবেচিত হয়েছে। এসব আরকানকে আল্লাহর বিভিন্ন যিক্‌র দ্বারা পরিপূর্ণ করা হয়েছে, যাতে করে এ সকল

---

[১] আল-কুরআন, *সুরা আল-ইসরা*, ১৭:১১০

দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে পাক কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ

'নিশ্চয়ই নামায অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে।'[১]

ইরশাদ হয়েছে,

وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مَعَكُمْ ۗ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ ۚ

'(আল্লাহ তাআলা বলেন,) আমি তোমাদের সাথে থাকব যদি তোমরা নামায কায়েম কর।'[২]

নামাযের বর্ণনা

ইসলামের ৫ স্তম্ভের মধ্যে নামায অন্যতম একটি প্রধান স্তম্ভ। ঈমানের পরেই নামাযের স্থান। ইসলামে নামায ৪ পর্যায়ের। যথা– ১. ফরয, ২. ওয়াজিব, ৩. সুন্নাত ও ৪. নফল।

ফরয: যেসব পড়ার জন্য স্বয়ং আল্লাহ তাআলা সহীহ বা স্পষ্টভাবে আদেশ করেছেন তাই ফরয নামায। ফরয নামায আবার দু'প্রকার। যথা–

১. প্রথমত ফরযে আইন। যথা– দৈনিক ৫ বার নামায আদায় যা প্রত্যেক আকেল, বালেগ মুসলমান নর-নারীর জন্য অবশ্যই কর্তব্য তাই ফরযে আইন।

২. দ্বিতীয়ত ফরযে কিফায়া। যথা– জানাযার নামায। এটি সকলের ওপর আদায় করা ফরয হলেও একই মহল্লা বা একই স্থানের কিছু লোক আদায় করলে সকলের দায়িত্বে আদায় হয়ে যায়।

ওয়াজিব: যে নামায সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার আদেশ আছে, তবে স্পষ্ট নয় বরং অস্পষ্ট, এ ধরনের নামাযকে ওয়াজিব নামায বলা হয়। যেম– বিতরের নামায, দু'ঈদের নামায।

সুন্নাত: যেসব নামায হযরত নবী করীম (সা.) নিজে আদায় করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে ও আদায় করতে বলেছেন, আবার কখনও কোনো নামায নিজে পড়েছেন, কিন্তু সাহাবাগণকে সে সম্পর্কে কোনো প্রকার আদেশ

---

[১] আল-কুরআন, *সুরা আল-আনকাবুত*, ২৯:৪৫

[২] আল-কুরআন, *সুরা আল-মায়িদা*, ৫:১২

বা নিষেধ কিছুই করেননি, এ প্রকারের নামাযগুলোই সুন্নাত। যোহর নামাযের ফরযের পূর্বে ৪ রাকাআত ও পরের দু'রাকাআত, মাগরিব ও ইশার নামাযের ফরযের পরের দু'রাকাআত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা (আবশ্যিক), আর আসর ও ইশার নামাযের ফরযের আগের ৪ রাকাআত সুন্নাতে গায়রে মুওয়াক্কাদা বা জায়েদার (ঐচ্ছিক) অন্তর্ভুক্ত।

নফল: উল্লিখিত ৩ প্রকারের নামায ব্যতীত বাকি নামায নফল নামায হিসেবে গণ্য। সুন্নাতে যায়েদা ও সব প্রকারের নামায পড়লে সওয়াব হবে, কিন্তু না পড়লে কোনো গুনাহ নেই।

সাহচর্যের গুরুত্ব ও উপকারিতা

সাহাবায়ে কেরাম কেবলমাত্র কুরআন পড়ে নিজেদের বাতেনী চিকিৎসা সম্ভব নয় বলে নবী করীম (সা.) থেকে সবকিছু জিজ্ঞেস করতেন। নবী করীম (সা.)-এর দরবারে সাহাবায়ে কেরামের জন্য হাসপাতালস্বরূপ ছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ

'আল্লাহ তাআলা নবী করীম (সা.)-কে রিসালাতের দায়িত্ব দিয়ে তাদের নিকট মনোনীত করে প্রেরণ করেছেন, তিনি আল্লাহ তাআলার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে তাদেরকে শোনান, তাদের জীবনের জাহেরী ও বাতেনী উভয় দিকের পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের তালীম দেন এবং কিতাবের আহকাম বোঝার ও বাস্তবায়িত করার জ্ঞান ও নিয়ম পদ্ধতি শিক্ষা দেন।'[১]

এর দ্বারা বোঝা যায় যে, কুরআন শিক্ষা এক কথা, আমল করে পরিশুদ্ধি লাভ করা ভিন্ন কথা। আমার পীর সাহেব কেবলা মরহুম শাহ সুফি মাওলানা মীর মুহাম্মদ আখতর (রহ.) ফরমায়েছেন,

لَآ اِلٰهَ اللّٰهُ گفتن دیگر است، لَآ اِلٰهَ اللّٰهُ شنیدن دیگر است، لَآ اِلٰهَ اللّٰهُ شدن دیگر است۔

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলা এক কথা, এটি শোনা অন্য কথা এবং জাতে পাকের মুহাব্বতে নিজ অস্তিত্ব বিলীন করে দেওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা।'

---

[১] আল-কুরআন, *সুরা আল-জুমুআ*, ৬২:২

শরীরের জাহেরী রোগের চিকিৎসার জন্য যেমন ডাক্তারের প্রয়োজন, তেমনি কলব ও নফসের গোপনীয় রোগসমূহ যেগুলো মারাত্মক, অতীব সূক্ষ্ম এবং গোপনীয়, চোখে পড়ে না এগুলোর চিকিৎসার জন্য বাতেনী চিকিৎসক অর্থাৎ পীরে কামিলের অত্যন্ত প্রয়োজন। মুরশিদে কামিলের সঙ্গলাভ করার গুরুত্ব পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা ও প্রমাণিত। যেমন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٩﴾

'হে ইমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর এবং আল্লাহর বিশ্বস্ত বন্ধুদের (সাদিকীনের) সঙ্গ লাভ কর।'[১]

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ﴿٢٣﴾

'মুমিনদের মধ্যে এমন কতগুলো লোক রয়েছেন যারা আল্লাহ তাআলার সাথে কৃত অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করেছেন।'[২]

মুফাসসিরীনে কেরাম উক্ত আয়াতদ্বয়ে সাদিকীন অর্থ মুরশিদে কামেলই নিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদের সান্নিধ্য লাভের নির্দেশ প্রদান করেছেন,

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ﴿٢٨﴾

'যারা সকাল বিকাল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলাকে ডাকে (যিক্‌রে রত থাকে) তাঁদের সান্নিধ্যে ধৈর্যের সাথে অবস্থান করুন।'[৩]

وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا ﴿٢٨﴾

'যাদের কলব আল্লাহ তাআলার যিক্‌র থেকে গাফিল ও অবহেলিত রয়েছে তাদের অনুসরণ কর না।'[৪]

وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ﴿١٥﴾

'এবং যারা দীনী ইলম বা জ্ঞানার্জন করে করে আমার দিকে ঝুঁকে পড়েছে তাদের পথই অনুসরণ কর।'[৫]

---

[১] আল-কুরআন, *সুরা আত-তাওবা*, ৯:১১৯
[২] আল-কুরআন, *সুরা আল-আহযাব*, ৩৩:২৩
[৩] আল-কুরআন, *সুরা আল-কাহাফ*, ১৮:২৮
[৪] আল-কুরআন, *সুরা আল-কাহাফ*, ১৮:২৮
[৫] আল-কুরআন, *সুরা লুকমান*, ৩১:১৫

উল্লিখিত আয়াতসমূহ দ্বারা নবী করীম (সা.)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ তাআলা উম্মতদেরকে আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। যেসব ব্যক্তি দুনিয়াবি লোভ-লালসায় লিপ্ত হয়েও শয়তানের প্রলোভনে পড়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) বা তাঁর ওয়ারিসগণের সম্পর্ক দুনিয়াতে কায়েম করেনি তারা হাশরের দিন অনুতপ্ত হয়ে বলবে,

يٰلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ﴿٢٧﴾ يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِيْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا ﴿٢٨﴾ لَقَدْ اَضَلَّنِيْ
عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَنِيْ ؕ وَ كَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا ﴿٢٩﴾

'আমি কেন রাসূল (সা.)-এর পথ অনুসরণ করলাম না এবং কেন আমি আল্লাহ তাআলার নেক বান্দাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করলাম না, এজন্যই আমার আফসোস।'[১]

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কালামে পাকে ইরশাদ ফরমান,

اَلْاَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ ﴿٦٧﴾

'দুনিয়াবি স্বার্থ ও লোভের জন্য যারা পরস্পর বন্ধুত্বের সম্পর্ক কায়েম করবে কিয়ামতের দিন তারা পরস্পর একে অপরের শত্রুতে পরিণত হবে। অবশ্য যদি ঈমানের স্বার্থে ও দীনী লাভ হাসিল করার উদ্দেশ্যে সে সম্পর্ক আল্লাহ তাআলার পথের পথিকদের সাথী হওয়ার যাদের নসীব হয়েছে।'[২]

তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা নিজেই প্রশংসা করতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন,

وَ حَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ﴿٦٩﴾

'সেসব লোক তাদের কতই না সুন্দর ও উত্তম সাথী।'[৩]

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ ফরমান,

«دِيْنُ الرَّجُلِ دِيْنُ جَلِيْسِهِ».

'মানুষের ধর্ম তার সহচর্চের ধর্মের ন্যায়।'

কোনো ব্যক্তির দীনী ভাবধারা কি রকম তা জানতে হলে দেখতে হবে যে, সে কি রকম ব্যক্তির সাথে ওঠা-বসা করে। যদি সে সালিহীন বা

---

[১] আল-কুরআন, ***সুরা আল-ফুরকান***, ২৫:২৭–২৯

[২] আল-কুরআন, ***সুরা আয-যুখরুফ***, ৪৩:৬৭

[৩] আল-কুরআন, ***সুরা আন-নিসা***, ৪:৬৯

মুরশিদের সাথে সম্পর্ক রাখে তখন সে তাদের মধ্যে গণ্য। যদি সে যাকিরীনের সাথে ওঠা-বসা করে তাহলে সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে পবিত্র হাদীসে আরও ইরশাদ হয়েছে,

«مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ».

'যে ব্যক্তি কোনো জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে সে তাদেই মধ্যে গণ্য।'[১]

«الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ».

'যে ব্যক্তি যাকে ভালবাসে সে তার সাথী।'[২]

পবিত্র হাদীসের বাণী দ্বারা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, যে যাকে ভালবাসে এবং যে যাদের সাথে রূপ ধারণ করে বা অনুকরণ ও অনুসরণ করে তাদের সাথে তার হাশর হবে। এতে প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তি পীর-মাশায়েখের সাথে সম্পর্ক কায়েম করবে এবং তাঁদের পথে অটল বিশ্বাস রেখে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য ধৈর্য-সহকারে স্বীয় জীবন অতিবাহিত করবে তা পরকালে তাঁদের নাজাতের ওসীলা হবে, বেহেশতে তাঁরা একই সাথে থাকবে এবং আল্লাহ তাআলার দীদার ও দর্শন লাভে ধন্য হবে।

মাওলানা জালালউদ্দীন রুমী (রহ.) তাঁর বিখ্যাত *মসনবী* গ্রন্থে আল্লাহ তাআলার মাহবুব বান্দাদের জাহেরী সুরত অনুকরণ যে আল্লাহ তাআলার কাছে পছন্দনীয় এবং তা যে নাজাতের ওসীলা হতে পারে সে প্রসঙ্গে বলেছেন,

'হযরত মুসা (আ.)-এর জমানায় একজন বহুরূপী লোক ছিল, সে হযরত মুসা (আ.)-এর বেশ গ্রহণ করে তামাশা দেখাতো। সেও হযরত মুসা (আ.)-এর পোষাকের জাহেরী অনুকরণের দ্বারা ফেরউনের সৈন্যদের সাথে থেকেও মুক্তি পেয়েছিল।'

মাওলানা রুমী (রহ.) বলেন,

---

[১] আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ৪, পৃ. ৪৪, হাদীস: ৪০৩১, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত

[২] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৮, পৃ. ৩৯, হাদীস: ৬১৬৯, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত

صورت محبوب را محبوب داں ☆ غرق را کئی بود قابل مشفقاں

'আল্লাহর মাহবুব বান্দাদের জাহেরী পোষাক পরিধান করা সেটিও আল্লাহ তাআলার কাছে প্রিয়। সেসব বান্দাদেরকে কিভাবে আল্লাহ তাআলা ডুবিয়ে মারবেন যারা আল্লাহ তাআলার দয়ার পাত্র।'

উল্লিখিত ইলমে তাসাওউফ বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং জাহেরী-বাতেনী ইলম এক সাথে যাঁরা লাভ করেছেন তাঁরাই মুরশিদে কামিল। তাঁদেরই সান্নিধ্যে বা সংশ্রবে থেকে নিজ জীবনের বিভিন্ন রোগ হতে মুক্ত হওয়া এবং তাঁদের অনুকরণ ও অনুসরণে বাতেনী জ্ঞানের অবগতি লাভ করা হয়। শুধু জাহেরী ইলম দ্বারা পবিত্র কুরআনের তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করা সম্ভবপর নয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা (আ.) ও হযরত খিযির (আ.)-এর ঘটনা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন। কুরআনের উক্ত ব্যাখ্যায় মুফাসসিরে কুরআনগণ বলেন,

'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) নবী করীম (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন, 'একদিন হযরত মুসা (আ.) বনী ইসরাঈলের মধ্যে ওয়ায করছিলেন। ওয়াযে মুগ্ধ হয়ে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার চেয়ে এ জমানায় বড় আলিম আর কেউ আছে কি? তিনি উত্তরে বললেন, সবচেয়ে আলিম বর্তমানে আমি নিজকেই মনে করি। [হযরত মুসা (আ.) এ দীনী ইলমের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করা ঠিকই ছিল। কারণ তিনি ছিলেন আল্লাহ তাআলার একজন নবী। তাই নবীর থেকে বড় আলিম আর কে হতে পারে?] এ প্রশ্নের উত্তর আল্লাহ তাআলার প্রতি ন্যস্ত না করাতে আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা (আ.)-এর নিকট অহী পাঠালেন, হে মুসা! আমার এক বিশিষ্ট বান্দা আছেন, যিনি তোমার চেয়ে অধিক ইলম রাখেন। হযরত মুসা (আ.) আরয করলেন, হে আল্লাহ! কিভাবে আমি তাঁর সাক্ষাৎ পেতে পারি?''[১]

উক্ত ঘটনাটি পবিত্র কুরআনের ১৫ পারার শেষ দিকে ও ১৬ পারার শুরুতে আল্লাহ পাক বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। পবিত্র *সহীহ আল-বুখারী* শরীফের হাদীসেও এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। (আমি বিস্তারিতভাবে এ ঘটনা বায়তুশ শরফ আনজুমানে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত আমার *রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক দৃষ্টিতে পীর-আউলিয়ার গুরুত্ব* নামক পুস্তকে বর্ণনা করেছি। বিস্তারিত জানার জন্য তা পাঠ করার পরামর্শ রইলো।)

---

[১] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ৩৫–৩৬, হাদীস: ১২২

নবী করীম (সা.) উক্ত ঘটনা বর্ণনা করার পর ফরমায়েছেন,

«يَرْحَمُ اللهُ مُوْسَىٰ، لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّىٰ يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا».

'হে আল্লাহ! মুসা (আ.)-কে রহম করুন। তিনি ধৈর্য ধারণ করলে ভালো হতো।'[১]

আমরা উক্ত ঘটনা থেকে এই উপদেশ লাভ করতে পারি যে,

১. জাহেরী ও বাতেনী ইলম উভয়ই জ্ঞান এক নয়।

২. বিভিন্ন মুফাসসিরীনে কেরাম বলেছেন যে, হযরত খিযির (আ.) একজন আল্লাহর অলী। আল্লাহ তাআলা তাঁকে সৃষ্টিরহস্য ও তত্ত্বজ্ঞান দান করেছেন হযরত মুসা (আ.) যা বুঝতে অক্ষম ছিলেন, অথচ তিনি একজন বড় নবী ছিলেন।

৩. পবিত্র কুরআনের ইঙ্গিতে বোঝা যায়, বাতেনী বা আল্লাহপ্রদত্ত বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিগণের সান্নিধ্য লাভ ও ধৈর্যধারণ করতে পারলেই জাহেরী ও বাতেনী ইলম লাভ করা যায়।

---

[১] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ৩৬, হাদীস: ১২২

মানব জীবনে তরীকত ও আধ্যাত্মিক সাধনার প্রয়োজনীয়তা

হযরত নবী করীম (সা.) এক হাদীসে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে,

«إِنَّ الْإِسْلَامَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَىٰ جُحْرِهَا».

'স্বর্প যেমন গর্ত থেকে বের হয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং সবশেষে পুনরায় সে গর্তে প্রবেশ করে তেমনি ইসলামও মদীনা শরীফ থেকে বের হয়ে জাহেলিয়াতের প্রাচীর ভেদ করে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু পরিশেষে পুনরায় সাপের গর্তে ফিরে আসার মতো মদীনার ফিরে যাবে।'[১]

অপর এক হাদীসে নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন,

«لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ: اللهُ، اللهُ».

'যতো দিন দুনিয়ার বুকে মানুষ আল্লাহকে ডাকবে আল্লাহ-আল্লাহ করার মানুষ যতো দিন থাকবে ততদিন আল্লাহ পাক চন্দ্র-সূর্যের আলো বন্ধ করবেন না, ততো দিন কিয়ামত সংঘঠিত হবে না।'[২]

পৃথিবীতে মুসলমানের সংখ্যা অনেক। ইসলাম দুনিয়ার অনেক দেশে এখনো ছড়িয়ে আছে। আল্লাহ আল্লাহ বলার লোকও অনেক আছে। কিন্তু গভীরভাবে বর্তমান পরিস্থিতির মূল্যায়ন করলে এক ভয়াবহ চিত্রই আপনাদের সামনে ফুটে ওঠবে। বুঝতে পারবেন যে, হযরত রাসূলে পাক (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী কার্যকর হতে যাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী অমুসলিম শক্তি একত্রিত হয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের উৎখাত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। ইউরোপ

---

[১] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ১৫, পৃ. ২৮৩, হাদীস: ৯৪৭১, হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত

[২] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ১৩১, হাদীস: ১৪৮, হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) থেকে বর্ণিত

থেকে শুরু করে আরব, পাক-ভারত উপমহাদেশ ও বাংলাদেশেও অমুসলিম শক্তিসমূহ ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়েছে। অথচ এ শত্রুদের ব্যাপারে আমাদের ভূমিকা অত্যন্ত দুর্বল। ইহুদি-নাসারারা ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চিরদুশমন। কিয়ামত পর্যন্ত তারা এ দুশমনিতে রত থাকবে। এটা শুধু হাদীসের কথা নয়, কুরআন মজীদে আল্লাহর স্পষ্ট ঘোষণা ইহুদি-খ্রিস্টানেরা কোনদিন ও তোমাদের বন্ধু হবে না।

لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَآءَ ۘ

'তোমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ কর না।'[১]

আপনারা বলুন, সারা বিশ্বে আমরা কি আজ আল্লাহর এ নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করছি না? আরবের একটি দেশের কথা বলি। দীর্ঘদিন যেখানে বসবাসরত একজন বাংলাদেশি দেশে আমাকে দুঃখ করে বলছিল, সকাল বেলা অযু-নামায শেষে যখন টেলিভিশন খুলি প্রথমে সে দেশের রাজার ছবি ভেসে আসে। এর সাথেই টিভির পর্দায় ভেসে আসে মার্কিন প্রেসিডেন্টের ছবি। আমেরিকা আর আমরা পরম বন্ধু, একথাই বোঝানো হয় এর মাধ্যমে। আমেরিকার নাম উচ্চারণ করলেই সে দেশের পুলিশ চোখ রাঙিয়ে দেখে। শুধু আরবে নয়, আমাদের দেশেও এসে গেছে। সারা দুনিয়ায় তারা মুসলমানদেরকে লাকড়ির মতো জ্বালাচ্ছে। আর এখানে সাহায্যের নামে শোষণের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। তারা জানে না যে, বাংলাদেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ। এখানে কুরআন, ইসলাম, আল্লাহ ও রাসূল (সা.) এবং মসজিদ-মাদরাসার কদর বেশি, তাই সুপরিকল্পিতভাবে আমাদেরকে ঈমানহারা করার জন্য জাতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য ও স্বাধীনতাকে বিনষ্ট করার জন্য এরা দারিদ্রমোচন, অশিক্ষা দূরিকরণ, সাহায্য ও ত্রাণ প্রভৃতি সাইন বোর্ড নিয়ে এসেছে। তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করি, বসনিয়ায় যে লাখে লাখে মানুষ মারা হচ্ছে তাদের জন্য তোমরা সাহায্য নিয়ে যাওনা কেন? সোমালিয়ায় তারা এ ধরনের শোষণ তৎপরতার মাধ্যমে কিছু লোককে প্রথমে খ্রিস্টান বানায়, এরপর দেশের ভেতরে পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ লাগিয়ে দিয়ে মীমাংসার নামে সামরিক অভিযান চালায়। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে, ফিলিস্তিনে এভাবেই তাদের ষড়যন্ত্র কার্যকর করেছে। আমাদের দেশেও এ ধরনের পরিস্থিতি ঘটানোর প্রস্তুতি চলছে।

---

[১] আল-কুরআন, *সুরা আল-মায়িদা*, ৫:৫১

কক্সবাজার, চকরিয়া, কুতুবদিয়া প্রভৃতি অঞ্চল সফর করে আমি অবাক হয়ে যাই। কিভাবে একটি স্বাধীন দেশের ভেতর বাইরের দুনিয়া থেকে এনজিও এসে নিজেদের ইচ্ছামতো রাস্তাঘাট, স্কুল নির্মাণ করছে। তাহলে দেশের সরকার থাকার কি অর্থ দাঁড়ায়। এক মহিলা আমাকে বলল, ওরা আমাকে খ্রিস্টান হওয়ার জন্য প্ররোচনা দিচ্ছে। বলছে, খ্রিস্টান হলে প্রথম কিস্তি ৩০ হাজার টাকা দেবে। পরে আরও দেবে।

এ ধরনের ষড়যন্ত্র গ্রাম থেকে নিয়ে উপরের মহল পর্যন্ত সমানে চলছে। আপনারা কিছুদিন আগে লক্ষ করেছেন যে, সরকারি মহলের এক বেটি কুরআনের বিরুদ্ধে কথা বলেছে। অমুসলমানদের ষড়যন্ত্র তো আছেই এসব মুসলমান নামধারীও ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। বিদেশিরাই যে এদের মদদ যোগাচ্ছে তার প্রমাণ এর আগেও আপনারা দেখেছেন। একটি কুলাঙ্গার নষ্টা মেয়েকে এখন পশ্চিমা জগতে নিয়ে লালন-পালন করা হচ্ছে।

কেউ হয়ত বলবেন যে, হুযুর রাজনৈতিক বক্তব্য দিচ্ছেন। আমার কথাগুলো নিছক কোনো রাজনৈতিক কথা নয়। আমি ইসলামের কথাই বলছি। আমি কোনো দল করি না। আমি ইসলামের পক্ষে আছি এটাই যথেষ্ট। ইসলাম আল্লাহর ধর্ম। যারা ইসলামের জন্য কাজ করছে, আমি মনে করি যে, তাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকেই কাজ করছে। আমি তাঁদের সব কথায় একমত হতে না পারলেও ইসলামের কথায় একমত। বাবরি মসজিদ, ভারতীয় বিশ্বকোষে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আবমাননা, সালমান রুশদী প্রসঙ্গ প্রভৃতি ইস্যুতে আমি মাঠে নেমেছি। ভবিষ্যতেও নামবো ইনশাআল্লাহ। আমি সবসময় ইসলামের পক্ষেই থাকবো। আজ যে বিষয়টি সম্পর্কে আপনাদের সতর্ক করে দিতে চাই, তাহলো আমাদের দেশের ভেতর পরিচালিত গভীর ষড়যন্ত্র। সোমালিয়ার মতো কিছু লোককে খ্রিস্টান বানানোর পর বাংলাদেশেও তারা ভাইয়ে ভাইয়ে গৃহযুদ্ধ লাগিয়ে দেবে।

আমরা যখন এসব কথা বলি, তখন একশ্রেণির লোক বলে যে, হুযুররা শুধু ফতওয়া দিতে জানেন। আমাদের জন্য কি করেছেন? আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্পর্কে কই তাঁদের কোনো তৎপরতা তো নেই। আপনি পেটের জন্য চিন্তিত। অথচ আমার কছে আমার ঈমান, বিশ্বাস, স্বাধীনতা ও স্বকীয় ঐতিহ্যের মূল্য অনেক বেশি। খাদ্যের জন্য, চাকুরির জন্য নিজের ঈমান ও বিশ্বাসকে জলাঞ্জলি দিয়ে বিদেশিদের তল্পীবাহক হচ্ছেন এর চেয়ে লাজ্জার বিষয় আর কি আছে! আমার কাছে খাদ্য, পেট ও সম্পদের

চেয়ে ঈমানের মূল্য বেশি। ওলামায়ে কেরাম গোটা জাতির ঈমান তথা স্বকীয় চিন্তা-বিশ্বাস ও ঐতিহ্যকে ধরে রাখার জন্য কি না করেছেন? অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে মসজিদ, মাদরাসা, ওয়ায-নসীহত প্রভৃতি ধরে রেখেছেন। আপনার ছেলে-সন্তানদের ইসলাম শিক্ষা দেওয়ার জন্য জান-প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। আপনারা কয়জন আলেমকে দেখবেন অর্থশালী। তারা কি ব্যবসায় নেমে যেতে পারেন না। অথচ মসজিদ, খানকায় মাদরাসায় জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন। ঈমান ও ইসলামের খেদমত করে যাচ্ছেন।

হযরত নবী করীম (স.) ইরশাদ করেছেন,

'এমন এক সময় আসবে যখন ঈমান রক্ষা করা অনেক কঠিন হবে। হাতের তালুতে জ্বলন্ত কয়লা রাখার মতো অসহ্য হবে।'

আজ এ ধরনের পরিস্থিতিতেই ওলামায়ে কেরাম সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। আমরা না খেয়ে থাকব, মরে যাব তবুও ঈমান হরণ হতে দেব না। মক্কার উচ্চবংশীয় সাহাবায়ে কেরাম ঘর-বাড়ি, সহায়-সম্পদ ছেড়ে মদীনায় হিজরত করেছিলেন ইসলামের ও ঈমানের দাবি পূরণ করার জন্য। যদি ধন-সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্যের মূল্য বেশি হত তাহলে তারা কি হিজরত করে অভাবী হতেন? নবী করীম (সা.) বলেছেন,

'দীন ও ঈমান রক্ষার ক্ষেত্রে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে যে, ঈমানদাররা পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেবে।'

পরিস্থিতির বাস্তব মূল্যায়ন করলে আজ আমরা এ ধরনের অবস্থারই সম্মুখীন। হাদীস শরীফের ভাষ্য অনুযায়ী:

'ঈমান রক্ষার জন্য যদি হাতে না পার অন্তত ঈমানের রশিকে দাঁতে কামড়ে ধর। গাছের পাতা খেয়ে থাক, তবুও ঈমান ইসলামকে জলাঞ্জলি দিও না।'

আমাদের দেশে কোটি-কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ঈমান ধ্বংসের এ পক্রিয়া শুরু হয়েছে। তাই সেকথাগুলো আপনারা বোঝার জন্য জোর দিয়ে উল্লেখ করলাম। আপনারা হয়ত লক্ষ করেছেন যে, শিক্ষাখাতে যে বিদেশি সাহায্য দেওয়া হচ্ছে তাতে সম্প্রতি বলে দেওয়া হয়েছে, এ সাহায্য ধর্মীয় শিক্ষার জন্য ব্যয় করতে পারবে না। এবার বুঝতে পারেন ষড়যন্ত্রের এবং সাহায্যের নামে ভাওতাবাজদের আসল উদ্দেশ্য কী? সারা দুনিয়ায় তারা মুসলমানদের ধ্বংস করেছে। এদিকে বৈঠক আলোচনার প্রহসন করছে। আর এখানে এসে বাংলাদেশিদের জন্য দরদে গদগদ হয়ে কুম্ভিরাশ্রু ঝরায়। এগুলো সবই মিথ্যা, ভণ্ডামী এবং ষড়যন্ত্র।

তারা গণতন্ত্রের দোহাই দেয়। ঈমান ও ইসলামের বিরুদ্ধে বলার লাইসেন্সই কি গণতন্ত্র? ইসলামি গণতন্ত্রে যা আছে তা পশ্চিমা গণতন্ত্রে নেই। পশ্চিমা গণতন্ত্র প্রতারণা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। এ গণতন্ত্রে ভালো-মন্দ শিক্ষিত-মূর্খ সব মানুষ এক সমান। মনে করুন, বেনামাযী সন্ত্রাসী সব এক হয়ে ভোট দিল এবং জোর করে ভোট নিল। তার মাধ্যমে যারা নির্বাচিত হয়ে আসল তাদের কি ইসলাম অনুমোদন দিতে পারে? এ গণতন্ত্র থাকলে বাংলাদেশের নামায থাকবে কি থাকবে না এ বিষয়েও ভোট হতে পারে। তখন হয়তো নামাযের বিরুদ্ধেই রায় দেয়া হবে। আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, পাকিস্তান আমলের শেষের দিকে কমিউনিস্টদের সভায় এক হাতে ভাতের বাসন আরেক হাতে কুরআন তুলে ধরে বলা হয়েছিল, 'কুরআন চাও, না ভাত চাও?' সভায় উপস্থিত দলীয় লোকেরা জবাব দিয়েছিল, 'ভাত চাই।' আমার এসব কথাকে সংকীর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বোঝার চেষ্টা করলে ভুল হবে। আমি ঈমানের কথা বলছি। বর্তমান পরস্থিতির আলোকে আপনাদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

আমি যে রাজনীতি মোটেও পছন্দ করি না সে কথা বলছি না। তবে কোনো দলের সাথে আমি জড়িত নই। ইসলামকে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যারা দলীয় কাঠামোতে প্রচেষ্ঠা চালাচ্ছে তাদের মধ্যে অনেক দল আছে। আমি তাঁদের প্রচেষ্টাকে খাটো করে দেখতে চাই না। এ ধরনের প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে এবং তা জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু যদি দাবি করা হয় যে, এটাই একমাত্র জিহাদ তাহলে ভুল হবে এবং অনেক ভুলের জন্ম দেবে। ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন মাদরাসা ও মসজিদকে কেন্দ্র করে ইসলামের খেদমত করে যাচ্ছেন এবং বিভিন্ন হক্কানি পীর-বুযুর্গ খানকা কেন্দ্রিক ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত। রাজনীতির ময়দানেও ইসলামের নামে বিভিন্ন দল থাকা স্বাভাবিক। যদি পারস্পরিক রেষারেষি না থাকে তাহলে কোনো সমস্যা হবে না, বরং কাজ বেশি হবে। তবে জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

আমি ওয়াদা করে বলছি, যদি জাতীয় প্রয়োজনে সকল ইসলামী দল ঐক্যবদ্ধ হয় তাহলে আমিও তাঁদের সাথে যোগ দেবো। ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়বো। এর আগ পর্যন্ত এদেশে এবং ভারতবর্ষে বুযুর্গানে দীন যে ধারায় কাজ করছেন, আমিও সেই ধারায় ইসলামের খেদমত নিয়োজিত থাকতে চাই। নিঃসন্দেহে এ কাজও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা ইতিহাস পর্যালোচনা

করলে আমরা দেখব যে, ইসলাম কেবল প্রচলিত অর্থে জিহাদ বা তরবারির জোরে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং নবী করীম (সা.)-এর চরিত্র, মহানুভবতা, দেখেই মানুষ আকৃষ্ট হয়েছে। অনুরূপভাবে ভারতবর্ষেও ইসলামের প্রচার-প্রসার হয়েছে সুফী-দরবেশদের দ্বারা। তাঁদের অমায়িক ব্যবহার ও সুন্দর চরিত্রের মধ্যেই মানুষ ইসলামের সৌন্দর্য দেখতে পেয়েছে। এরপর হাজার হাজার মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে। কাজেই আউলিয়ায়ে কেরাম আত্মশুদ্ধির পথ ধরে যে নীরব জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছেন তাকে অবমূল্যায়ন করা ইতিহাসকে অস্বীকার করার শামিল হবে। কেননা পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশ মিলে বর্তমান প্রায় ৪৫ কোটি মুসলমান। তা পীর-আউলিয়াদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও দাওয়াতী কার্যক্রমের ফসল। আউলিয়ায়ে কেরামের দাওয়াতী কার্যক্রমের মূলনীতি ও গ্রহণ করা হয়েছে পবিত্র কুরআন মজীদ হতে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ

‘আপনি হিকমত এবং উত্তম উপদেশ-সহকারে মানুষকে আপনার প্রভুর পথে আহ্বান করুন।’[১]

তাদের মধ্যে কেউ কেউ পীর-আউলিয়াদের নীরব জিহাদকে বুঝতে না পারার কারণে সমালোচনা করে। একটি কথায় হয়তো অনেকেই আমার সাথে একমত হবে না, তবুও বলতে হয়, যদি দলের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব না দিয়ে আউলিয়ায়ে কেরামের ইসলাম প্রচারের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে যেভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তা যদি অনুসরণ করা হতো তাহলে এত সংঘাত ও হানাহানি হত না। আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সহনশীলতার আদর্শকে ভুলে গেছি। তিনি জানের শত্রু কাফিরের প্রতি যে উদারতা দেখিয়েছেন তা আমাদের সম্মুখ থেকে এখন অনেক দূরে। এ অবস্থা দেখেই অনেক বিজ্ঞ লোক মন্তব্য করেছেন যে, ‘দলীয় ইসলাম আর নবীর ইসলাম এক নয়।’

‘একদিনের ঘটনা: এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মেহমান হয়। খাওয়া দাওয়ার পর ওই ব্যক্তিকে মসজিদে নববীতে থাকতে দেওয়া হয়। ঘটনাচক্রে রাতে লোকটির পেটব্যথা শুরু হয়ে যায় এবং ভোর হতে না হতেই বিছানাপত্র নষ্ট করে লোকটি পালিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) মসজিদে এসে অবস্থা দেখে বুঝতে পারলেন মেহমানের অসুবিধা হয়েছে। তিনি লোকটিকে খুঁজে উপস্থিত করার

---

[১] আল-কুরআন, *সুরা আন-নাহল*, ১৬:১২৫

হুকুম দিলেন, সাহাবীরা তাকে সন্ধান করার জন্য বেরিয়ে পড়লে লোকটি মসজিদ নষ্ট করার মর্মান্তিক পরিণতির কথা ভেবে প্রাণ হাতে নিয়ে দৌড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত তাকে ধরে যখন মসজিদে নববীতে উপস্থিত করা হয়, তখন লোকটি বিস্মিত বিহ্বল হয়ে দেখে যে, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজ হাতে বিছানাপত্র ধরে পরিষ্কার করছেন। লোকটিকে ডেকে তিনি বিনয়ের সুরে বললেন, 'ভাই তুমি আমার মেহমান ছিলে। রাতে আমি তোমার দেখাশোনা করিনি। কাজেই আমাকে ক্ষমা কর। তোমার প্রয়োজনের সময় আমি সাড়া দেইনি। এজন্যে কিয়ামতে আমাকে অপরাধী সাব্যস্ত কর না।"

আরেকদিন এক বেদুইনকে মসজিদে নববীতে পেশাব করতে দেখে রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবীদের বললেন, 'তোমরা তাকে বাধা দিও না, পেশাব শেষ করতে দাও।'

এরপর সে পেশাব পরিষ্কার করা হয় এবং তাকে এ ধরনের আচরণ ভবিষ্যত না করার জন্য বুঝিয়ে বলা হয়। আমার প্রশ্ন এ ধরণের সহনশীরতা কি আমাদের মাঝে আছে?

আমরা জানি ইসলাম এক। কিন্তু এ ইসলামের ৪ মাযহাব এবং আধ্যাত্মিক লাইনে ৪ তরীকা ইসলামসম্মত বলে স্বীকৃত। আল্লাহর কাছে এগুলো মকবুল তাহলে আমরা কেন শুধু আমার দলই হক ও সত্যের ওপর আছে, অন্যরা বাতিল এ ধরনের অহমিকার আশ্রয় নেব। ইসলামের আদেশ নিষেধ ও হুকুম-আহকাম রাষ্ট্রীয়ভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলনকে ইসলামি রাজনীতি বলা হয়, কিন্তু সবাই জানেন যে, শুধু আইন-কানুন জারি করলে ইসলাম হয়ে যাবে না। মানুষ যেন অন্তর দিয়ে ইসলামের বিধি-নিষেধ মেনে চলে তার জন্য মানুষের নৈতিক সংশোধন ও চারিত্রিক উন্নতি বিধানের প্রয়োজন। এ কাজটি অত্যন্ত সুন্দররূপে আঞ্জাম দেন আধ্যাত্মিক সাধকরা। এদিক থেকে বিবেচনা করলে মানুষের নফস ও চরিত্র সংশোধনের এ চেষ্টাও জিহাদ হিসেবে গণ্য। বরং হাদীস শরীফের ভাষ্য অনুযায়ী: 'এটিই জিহাদে আকবর (শ্রেষ্ঠতম জিহাদ)।' কারণ কারো চরিত্র সংশোধন, ব্যক্তিত্ব গঠন ও যোগ্যতার বিকাশ না হলে যুদ্ধ-বিগ্রহ করে সাময়িক বিজয় লাভ করলেও সে বিজয়কে ধরে রাখা সম্ভব হবে না। বিষয়টি একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে সবার কাছেই এর গুরুত্ব পরিষ্কার হয়ে পড়বে।

বুযুর্গানে দীন মানুষের নফসানি রোগ-ব্যাধির সংশোধনের জন্যে যেসব খাত বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে একটি হলো যিক্‌র। যিক্‌র মানে

আল্লাহকে স্মরণ করা। আল্লাহর নির্ধারিত ফরয ও ওয়াজিব ইবাদতের পর বিশেষ নিয়মে যিক্‌র করা মুস্তাহাবের মধ্যে গণ্য। ইবাদত-বন্দেগি ও আত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে যিক্‌রের ভূমিকা হলো ক্ষেতে সার দেওয়ার ন্যায়। যিক্‌র করা মানে ঈমানের গোড়ায় সার দেওয়া। মানুষের গোটা জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে তার কলব বা আত্মা। এ আত্মাকে সংশোধন করার কোনো প্রক্রিয়া দুনিয়ার কোনো জ্ঞানী-মনীষী ও বিজ্ঞানী আবিষ্কার করতে পারেননি। অথচ এ ক্বলবের ভালো-মন্দের ওপর সবকিছু নির্ভর করে। হাদীস শরীফে হযরত নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন,

«أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلُحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ».

'মানব-দেহের মধ্যে একটি গোশতের টুকরা রয়েছে। তা যদি সুস্থ থাকে তাহলে সমস্ত দেহটাই সুস্থ থাকবে। আর যদি তা নষ্ট হয়ে যায় তা হলে পুরো শরীরটাই নষ্ট হয়ে যাবে। সাবধান! মনে রেখ, এটাই হলো কলব।'[১]

দেহের পরিচর্যার জন্য আমরা ভাত-মাংস খেয়ে মুখে পেটে শান্তি পাই। কিন্তু আত্মার শান্তি কোথায়। আল্লাহ পাক তার জবাব দিয়ে বলেন,

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

'সাবধান! আল্লাহর যিক্‌রের দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।'[২]

পীর-বুযুর্গদের বাতলানো পন্থায় যিক্‌র করতে করতে যখন যিক্‌র অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায় তখন সবসময় আল্লাহর কথা স্মরণে আসে। আল্লাহর ভালবাসায় মন তৃপ্ত থাকে। বিশেষত চরম বিপদে-আপদে, মৃত্যুর সময়, সাকরাতের সময় আল্লাহর কথা স্মরণে আসে। মূলত যিক্‌রের দ্বারা মুর্দা কলব জিন্দা হয়ে যায়। যার কলব জিন্দা হয়েছে তার তো মৃত্যু নেই। সে শুধু এ জগত থেকে পর জগতে ইন্তেকাল করেন, স্থানান্তরিত হন। এ ধরনের যাকিরীন বান্দাই আল্লাহর পরম সান্নিধ্য লাভ করেন। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

---

[১] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ২০, হাদীস: ৫২; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৩, পৃ. ১২১৯, হাদীস: ১৫৯৯; হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রাযি.) থেকে বর্ণিত

[২] আল-কুরআন, *সুরা আর-রা'দ*, ১৩:২৮

«أَنَا جَلِيْسُ مَنْ ذَكَرَنِيْ».

'যে ব্যক্তি আমার যিক্‌র করে আমি তার সাথী হয়ে যাই।'[১]

আপনারা বলুন, জীবনে এর চেয়ে বড় সম্পদ আর কি হতে পারে? পরিশেষে আমি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পাশাপাশি আল্লাহর মাখলুকের সাথে সম্পর্ক উন্নত করার পরামর্শ দিচ্ছি। কেননা আল্লাহর বান্দাদের বিশেষ করে গরীব-দুঃখী অসহায়দের খেদমত করার মধ্যেই আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত। এ জন্যেই তরীকত বা আধ্যাত্মিক সাধনার অপর নাম খেদমত খালক। হযরত শেখ সা'দী (রহ.) অতিসুন্দর করে বলেছেন,

طریقت بجز خدمت خلق نیست ☆ بتسبیح و سجّادہ و دلق نیست

'তরীকত-আধ্যাত্মিক সাধনা আল্লাহর সৃষ্টির সেবা ছাড়া অন্য কিছু নয়। তসবীহ, সাজ্জাদা ও ছেঁড়া জামা বহন করার নাম তরীকত নয়।'[২]

অনুলিখনঃ মাওলানা মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী

২২ এপ্রিল ১৯৯৫ সাল

মসজিদ বায়তুশ শরফ, ঢাকা

---

[১] ইবনে আবু শায়বা, ***আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার***, খ. ১, পৃ. ১০৮, হাদীসঃ ১২২৪, হযরত কা'বুল আহবার (রাযি.) থেকে বর্ণিত

[২] শায়খ সা'দী, ***বোস্তাঁ***, পৃ. ৩৩

ইয়াকীন ইখলাস ও ইহসানের ভিত্তিতে ইবাদত করে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে হবে

আল্লাহ স্রষ্টা, বান্দা সৃষ্টি। আল্লাহকে পাওয়ার জন্য মহান আল্লাহ বান্দাকে কতগুলো মাধ্যম বা বিষয় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যেমন– নামায, রোযা, হজ ও যাকাত প্রভৃতি। অনুরূপ আল্লাহর অলীদের সৌন্দর্যময় জীবন চরিত্রে রয়েছে আমাদের জন্য আদর্শ। তাঁদের পুণ্যময় জীবনলেখ্যে আমরা রুহ বা আত্মার খোরাক পেয়ে থাকি।

আউলিয়া কেরামের পুণ্যময় জীবন আলোচনার নিমিত্তে যুগে-যুগে আল্লাহর বান্দারা শরীয়তসম্মত মাহফিল পালনের মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভে প্রয়াসী হয়েছেন। আমরাও বায়তুশ শরফের প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা মরহুম হযরত মাওলানা মীর মুহাম্মদ আখতর (রহ.)-এর সময় হতে ফাতিহায়ে ইয়াযদাহম পালন করে আসছি। এ মাহফিলও আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের একটি ওসীলা বা উপায়। এ ধরনের মাহফিল ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত কিছুই নয়, এমনকি মুস্তাহাবও নয়, তবে মর্যাদাগত দিক দিয়ে মহান। বিশেষ করে তরীকতপন্থি ভাইদের ঈমানী রুহানী সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য এ মাহফিলের ফযীলত অনেক। আল্লাহর অলীদের ওপর যাদের গভীর বিশ্বাস ও বাতেনী সম্পর্ক বিদ্যমান তাদের কাছে এ মাহফিলের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে-বাতেনী কি? বাতেনী হচ্ছে এমন একটি বিষয় যা অপ্রত্যক্ষ। পক্ষান্তরে শরীয়তের বাহ্যিক হুকুম-আহকাম, যেমন– অযু-গোসল, নামাযের নিয়ম-কানুন, রোযা, হজ ও যাকাত ইত্যাদি পালনের পদ্ধতি প্রত্যক্ষ বিষয়। শরীয়তের যাবতীয় হুকুম পালন করতে গিয়ে এমন একটি বিষয় বান্দার সামনে এসে উপস্থিত হয় যে, বিষয়টি আহকামে শরীয়তের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। যাকে আমরা বাতেনী বলে থাকি। আর ঈমান, ইখলাস, ইয়াকীন ও ইহসানের সমষ্টিগত নামই হলো বাতেন।

যেহেতু বান্দা যা আমল করবে তা একমাত্র মহান আল্লাহর জাতে পাকের উদ্দেশ্যেই নিবেদিত, তাই রিয়া তথা লোক দেখানোমুক্ত ইবাদতই ইখলাস। অর্থাৎ যে ইবাদত খাঁটি আল্লাহর ওয়াস্তে করা হয়, লোকদেখানো নয়।মানুষ আল্লাহর বান্দা আর আল্লাহ মাবুদ, সে মা'বুদকে মা'বুদ হিসেবে জেনে দিল-মন উপস্থিত করে গভীর মনোযোগের সাথে নামাযের রুকু-সিজদা, যিক্‌র ইত্যাদি কায়মনো বাক্যে আদায় করাকে ইখলাস বলা হয়। এ ইখলাসের অপর নাম হলো ইহসান। ইহসানের স্বরূপ উন্মোচন করত গিয়ে আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) হাদীসে জিবরীলে ইরশাদ করেছেন,

«أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ».

'তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ, যদিও তুমি তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারোনি তাহলে নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে প্রত্যক্ষ করছেন।'[১]

ইয়াকীন, ইখলাস ও ইহসান এ ত্রিবিদ বিশেষণ হলো তরীকতের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। সুফিয়ায়ে কেরাম হলেন তরীকতের দিকনির্দেশক, তাঁরা এগুলোর ধারক ও বাহক। আল্লাহর যিক্‌র বাতেনী ইবাদতসমূহের মাঝে একটি। এর মহত্ব ও গূঢ়তা অনেক বড়। কেননা মহান আল্লাহ বলছেন,

وَ لَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ

'অবশ্যই আল্লাহর যিক্‌র সবচেয়ে বড়।'[২]

আল্লাহর অলীগণ বান্দাদের অন্তরের কালিমা বিমোচন করে সে অন্তরে এক আল্লাহর আসন সৃষ্টির জন্য 'আল্লাহ', 'আল্লাহ', 'আল্লাহ' যিক্‌রের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। মানবমনের কালিমা যখন মুছে গিয়ে কলব আয়নাতুল্য হবে, তখন সে আয়নাতুল্য আত্মা দিয়ে বান্দা আহ্বান করবে, إِلٰهِيْ أَنْتَ مَقْصُوْدِيْ (মাবুদ গো! আমার যিক্‌র, আমার প্রার্থনা একমাত্র তোমার উদ্দেশ্যেই)। তারা আরও বলেন, وَرِضَاءُكَ مَطْلُوْبِيْ (হে মাবুদ! মালিক, আমার চাওয়া-পাওয়া একমাত্র তোমারই সন্তুষ্টি। তোমাকে পেলেই আমি সবকিছু পেয়েছি। হে মাওলা! মুনিব! তোমার সন্তুষ্টিতেই রয়েছে আমার ইহ ও পরকালের যাবতীয় কল্যাণ-অকল্যাণ)। জাতে বারী তাআলার সান্নিধ্যে আরও

---

[১] আল-বুখারী, ***আস-সহীহ***, খ. ১, পৃ. ১৯, হাদীস: ৫০, হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত

[২] আল-কুরআন, ***সুরা আল-আনকাবুত***, ২৯:৪৫

একধাপ এগিয়ে বান্দা বলেন, تَرَكْتُ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا (ওগো দয়াময় আল্লাহ! মাবুদ! তোমার সান্নিধ্য পেতে আমি পৃথিবীর যাবতীয় বিষয় পরিত্যাগ করে তোমার দরবারে এসেছি)।

যদিও বান্দার পক্ষে দুনিয়ার মমতা পরিত্যাগ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, এরপরেও বান্দার অবিরাম কাকুতি-মিনতিতে আল্লাহ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বান্দাকে সে স্তরে নিয়ে যায়, যে স্তরের জন্য ও বান্দা আকাঙ্ক্ষিত ছিল। এজন্য আল্লাহর মকবুল অলীরা শয়নে-স্বপনে, চলা-ফেরায় আল্লাহর যিক্‌র করেন।

একথা সকলের স্মর্তব্য যে, অযু-গোসল এবং নামাযের যাবতীয় শর্তাদি পূরণ হলে নামায শুদ্ধ হবে। এটা মুহাদ্দিস ও ফকীহদের মতামত। কিন্তু মুফাসসির ও সুফিয়ায়ে কেরাম বলেন, যে নামাযের মধ্যে বান্দার একাগ্রতা না থাকে, নামাযে খুশু-খুযু না থাকে তাহলে সে নামায নামাযই নয়, তাকে আত্মাহীন শরীরের সাথে তুলনা করা চলে। তাই তো মহান আল্লাহ ইরশাদ করছেন,

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝

'সেসব মুমিনরাই সফলকাম যাদের নামাযের মধ্যে রয়েছে দিল হাজের।'[১]

উদাহরণস্বরূপ নিম্নোক্ত উদাহরণটি এখানে প্রণিধানযোগ্য। কোনো এক মুফতি সাহেবের কাছে এক মূর্খ ব্যক্তি এ মর্মে ফতওয়া তালাশ করতে এসে বললেন, আমার বাড়ির কূপে একটি বিড়াল পতিত হয়ে বিড়ালটি সেখানেই মরে পঁচে দুর্গন্ধযুক্ত হলো। এমনকি দুর্গন্ধের কারণে পানিগুলোও ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ল? মুফতি সাহেব ফতাওয়া দিলেন যে, পুঁতিময় দুর্গন্ধযুক্ত বিড়ালটি প্রথমে কুপ থেকে তুলে ফেলে দিয়ে কূপের ৪০ বালতি পানি ফেলে দেবে তবেই কুপের পানি তোমার জন্য ব্যবহারের যোগ্য হবে।

লোকটি কূপ থেকে বিড়াল উত্তোলনের কথা ভুলে গেল। কিন্তু ৪০ বালতি পানি উত্তোলনের কথা সে বিন্দুমাত্র ভুলেনি। ৪০ বালতি শুধু নয়, তার দ্বিগুণ পানি ফেলার পরও সে দেখতে ফেল পানির রঙ ও দুর্গন্ধ পরিবর্তন হয়নি। লোকটি বিরক্ত হয়ে মুফতি সাহেবের কাছে চলে গেলেন এবং কূপের অবস্থা বর্ণনা করলেন, মুফতি সাহেব বিড়াল ফেলে দিয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করলে লোকটি হতোদ্যম হয়ে যায়। সে তার ভুল বুজতে পারে।

---

[১] আল-কুরআন, *সুরা আল-মুমীনুন*, ২৩:১–২

সুতরাং আমরাও মনের মাঝে পার্থিব লোভ-লালসা, ভোগ-বিলাস, হঠকারিতা, পরনিন্দা প্রভৃতি চর্চা করে আল্লাহর ইবাদত করি তাহলে সে ইবাদত কি কবুল হবে? লোনা জমিতে যতই বীজ বপন করা হোক না কেন সে জমিতে কি ফসল ফলবে? কলব নামক জমিতে আল্লাহর যিক্‌রের চাষ দিয়ে সেখানে যদি ওয়াহদানিয়াতের বীজ বপন করা হয় তখন সে বীজ থেকে উৎপন্ন হবে মা'রিফতের সঠিক দর্শন। হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রহ.) বলেন যে,

'বান্দা দুনিয়াদারী ত্যাগ করবে তা নয়, বান্দার হাতে, পকেটের মধ্যেই দুনিয়া সীমাবদ্ধ। কিন্তু অন্তরের মধ্যে সদা জাগ্রত থাকবে আল্লাহর মহোত্তম নাম। তখন বান্দা, إِلٰهِيْ أَنْتَ مَقْصُوْدِيْ *বলার সাথে সাথে আল্লাহ বলবেন, 'ওহে বান্দা, তুমি আমার আমি তোমার।''*

আল্লাহ আরও বলেন যে,

«أَنَا جَلِيْسُ مَنْ ذَكَرَنِيْ».

'আমি আল্লাহ তখন আরশে থাকি না আমি সে বান্দার নিকটেই চলে আসি।'[১]

আমার পীর-মুরশিদ বলেন যে, যখন আল্লাহ তোমার সাথী হয়ে গেছেন তখন দুনিয়া থেকে অঝোর ধারায় বারি চেড়ে দিয়ে তুমি বলতে থেক:

«اللهُ حَاضِرِيْ، اللهُ نَاظِرِيْ، اللهُ شَاهِدِيْ، اللهُ مَعِيْ».

কিছু সময়ের জন্য হলেও আল্লাহর দর্শন ও মিলন লাভ করা তা বেহেশতের যাবতীয় সুখ স্বাচছন্ধের চেয়ে সহস্রগুণ বেশি নিয়ামত। তাই তো পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ۚ

'আল্লাহর সন্তুষ্টিই সবচেয়ে বড়।'[২]

অনুলিখন: মাওলানা মুহাম্মদ মুহিব্বুর রহমান

২ আগস্ট ১৯৯৬ সাল

মসজিদ বায়তুশ শরফ, কক্সবাজার

---

[১] (ক) ইবনে আবু শায়বা, ***আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার***, খ. ১, পৃ. ১০৮, হাদীস: ১২২৪, হযরত কা'বুল আহবার (রাযি.) থেকে বর্ণিত; (খ) আল-জিলানী, ***আল-ফাতহুর রব্বানী ওয়াল ফায়যুর রহমানী***, পৃ. ২১

[২] আল-কুরআন, ***সুরা আত-তাওবা***, ৯:৭২

গ্রন্থপঞ্জি

॥আ॥

১. *আল-কুরআন আল-করীম*

২. আল-আজলূনী : আবুল ফিদা, ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল হাদী আল-জার্‌রাহী আল-আজলূনী আদ-দিমাশকী (১০৮৭–১১৬২ হি. = ১৬৭৬–১৭৪৯ খ্রি.), ***কাশফুল খিফা ওয়া মুযীলুল ইলবাস আম্ম ইশতাহারা মিনাল আহাদীস আলা আলসিনাতিন নাস***, মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪২০ হি. = ২০০ খ্রি.)

৩. আবু আওয়ানা : আবু আওয়ানা, ইয়াকূব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম আন-নায়শাপুরী (০০০–৩১৬ হি. = ০০০–৯২৮ খ্রি.), ***আল-মুসতাখরাজ***, দারুল মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.)

৪. ইবনে আবু শায়বা : আবু বকর, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে ওসমান ইবনে খাওয়াসিতী আবু শায়বা আল-আবাসী (১৫৯–২৩৫ হি. = ৭৭৬–৮৪৯ খ্রি.), ***আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার***, মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৯ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

৫. আবু দাউদ : আবু দাউদ, সুলায়মান উবনুল আশআস ইবনে ইসহাক ইবনে বশীর আল-আযদী আস-সিজিসতানী (২০২–২৭৫ হি. = ৮১৭–৮৮৯ খ্রি.), ***আস-সুনান***, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান

৬. আবদুল কাদির ঈসা: সাইয়েদ আবদুল কাদির ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কাসিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আযীযী আল-হালাওয়ী

আশ-শাযিলী (১৩৩৮–১৪১২ হি. = ১৯২০–১৯৯১ খ্রি.), ***হাকায়িকুন আনিত তাসাওউফ***, দারুল ইরফান, আলেপ্পো, সিরিয়া (সপ্তদশ সংস্করণ: ১৪২৮ হি. = ২০০৭ খ্রি.)

৭. আবুস সাউদ আল-ইমাদী: আবুস সাউদ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুস্তাফা আল-ইমাদী (৮৯৮–৯৮২ হি. = ১৪৯২–১৫৭৫ খ্রি.), ***তাফসীরু আবিস সাউদ = ইরশাদুল আকলুস সালীম ইলা মাযায়াল কুরআনিল করীম***, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, লেবনান

৮. কাযী আয়ায : আবুল ফযল, কাযী, আয়ায ইবনে মুসা ইবনে আয়ায ইবনে আমরূন আল-ইয়াহসাবী (৪৭৬–৫৪৪ হি. = ১০৮৩–১১৪৯ খ্রি), ***আশ-শিফা বি-তা'রীফি হুকূকিল মুস্তাফা***, দারুল ফিকর, দিমাশক, সিরিয়া (১৪০৯ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

৯. আহমদ ইবনে হাম্বল: আবু আবদুল্লাহ, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল ইবনে হিলাল ইবনে আসাদ আশ-শায়বানী (১৬৪–২৪১ হি. = ৭৮০–৮৫৫ খ্রি.), ***আল-মুসনদ***, মুআস্‌সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. = ২০০০ খ্রি.)

॥ই॥

১০. ইবনে কাইয়িম আল-জওযিয়া: মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে আইয়ুব ইবনে সা'দ আল-জওযিয়া (৬৯১–৭৫১ হি. = ১২৯২–১৩৫০ খ্রি.):

– ***তুহফাতুল মাওদুদ বি-আহকামিল মাওলুদ***, মাকতাবাতু দারুল বায়ান, দামিশক, সিরিয়া (প্রথম সংস্করণ: ১৩৯১ হি. = ১৯৭১ খ্রি.)

– ***যাদুল মা'আদ ফী হাদয়ি খাইরিল ইবাদ***, মুআস্‌সিসা আর-রিসালা, বয়রুত, লেবনান (সপ্তদশ সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)

১১. ইবনে খলদুন : আবু যায়দ, অলীউদ্দীন, আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে খলদুন আল-খাযরমী আল-ইশবীলী (৭৩২–৮০৮ হি. = ১৩৩২–১৪০৬ খ্রি.), ***দীওয়ানুল মুবতাদা ওয়াল খবর ফী তারীখিল আরব***

ওয়াল বারবার ওয়া মিন আসিরিহিম মিন যাওয়ীশ শানিল আকবর = তারীখু ইবনি খলদুন, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

১২. ইবনে মাজাহ : ইবনে মাজাহ, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ আর-রুবায়ী আল-কাযওয়ীনী (২০৯–২৭৩ হি. = ৮২৪–৮৮৭ খ্রি.), ***আস-সুনান***, দারু ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, বয়রুত, লেবনান

১৩. ইবনে হিব্বান : আবু হাতিম, মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান ইবনে আহমদ ইবনে মুআয ইবনে মা'বদ আত-তায়মী আদ-দারিমী আল-বসতী (০০০–৩৫৪ হি. = ০০০–৯৬৫ খ্রি.), ***আস-সহীহ = আল-ইহসান ফী তকরীবি সহীহ ইবনি হিব্বান***, মুআস্‌সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

॥ক॥

১৪. আল-কাস্‌তাল্লানী : আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে আবদুল মালিক আল-কাস্‌তাল্লানী আল-মিসরী (৮৫১–৯২৩ হি. = ১৪৪৮–১৫১৭ খ্রি.), ***আল-মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া বিল-মানহিল মুহাম্মাদিয়া***, আল-মাকতাবা আত-তাওফীকিয়া, কায়রো, মিসর

১৫. আল-কাসিম ইবনে সাল্লাম: আবু উবাইদ, আল-কাসিম ইবনে সাল্লাম আল-হারওয়ী আল-আযদী আল-খিযায়ী আল-খুরাসানী আল-বাগদাদী (১৫৭–২২৪ হি. = ৭৭৪–৮৩৮ খ্রি.), ***গরীবুল হাদীস***, আল-হাইয়াতুল আম্মা লি-শুয়ুনিল মুতাবি' আল-আমিরিয়া, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৪ হি. = ১৯৮৪ খ্রি.)

১৬. আল-কাশিফী : মোল্লা, মুঈনুদ্দীন, আলী ইবনুল হুসাইন আল-ওয়ায়িয আল-কাশিফী আল-হারওয়ী আল-বায়হাকী আস-সফী (০০০–৯১০ হি. = ০০০–১৫০৪ খ্রি.), ***আল-মাওয়াহিবুল ইল্লিয়া = তাফসীরে হুসাইনী***, কিতাবফুরুশীয়ে নূর, সারাওয়ান, ইরান

১৭. আল-কুশায়রী : আবু নসর, আবদুল করীম ইবনে হাওয়াযিন ইবনে আবদুল মালিক আল-কুশায়রী (০০০–৫১৪ হি. =

০০০–১১২০ খ্রি.), ***লাতায়িফুল ইশারাত***, আল-হাইয়াতুল মিসরিয়া আল-আম্মা লিল কিতাব, কায়রো, মিসর (তৃতীয় সংস্করণ)

॥জ॥

১৮. আল-জিলানী : মুহ্উদ্দীন, আবু মুহাম্মদ, আবদুল কাদির ইবনে মুসা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জঙ্গিদোস্ত আল-হুসাইনী আল-জীলানী/আল-কীলানী/আল-জীলী (৪৭১–৫৬১ হি. = ১০৭৮–১১৬৬ খ্রি.):

– ***আল-গুনয়াতু লি-তালিবায় তরীকিল হক আয্যা ওয়া জাল্লা***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৭ হি. = ১৯৯৭ খ্রি.)

– ***আল-ফাতহুর রব্বানী ওয়াল ফায়যুর রহমানী***, আল-মাকতাবাতুস সাকাফা আদ-দীনিয়া, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৭ হি. = ১৯৯৭ খ্রি.)

॥ত॥

১৯. আত-তাবারানী : আবুল কাসিম, সুলায়মান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব ইবনে মতীর আল-লাখমী আশ-শামী আত-তাবারানী (২৬০–৩৬০ হি. = ৮৭৩–৯৭১ খ্রি.):

– ***আল-মু'জামুল আওসাত***, দারুল হারামইন, কায়রো, মিসর

– ***আল-মু'জামুল কবীর***, মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, মিসর (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)

২০. আত-তিরমিযী : মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরা ইবনে মুসা ইবনুয যাহ্হাক আস-সুলামী আয-যরীর আল-বুগী আত-তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হি. = ৮২৪–৮৯২ খ্রি.), ***আল-জামি'উল কবীর = আস-সুনান***, মুস্তফা আলবাবী অ্যান্ড সন্স পাবলিশিং অ্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, সিরিয়া (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৯৫ হি. = ১৯৭৫ খ্রি.)

॥ন॥

২১. আন-নাসায়ী : আবু আবদুর রহমান, আহমদ ইবনে আলী ইবনে শুআইব ইবনে আলী ইবনে সিনান ইবনে বাহর ইবনে দীনার আল-খুরাসানী আন-নাসায়ী আল-কবীর (২১৫–৩০৩ হি. = ৮৩০–৯১৫ খ্রি.), ***আল-মুজতাবা মিনাস সুনান = আস-সুনানুস সুগরা***, মাকতাবুল মতবুআত আল-ইসলামিয়া, হলব, সিরিয়া (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

২২. আন-নায়সাপুরী : নিযামউদ্দীন, আল-হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন আল-কুমী আন-নায়সাপুরী (০০০–৮৫০ হি. = ০০০–১৪৪৬ খ্রি.), ***গারায়িবুল কুরআন ওয়া রাগায়িবুল ফুরকান***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৬ হি. = ১৯৯৫ খ্রি.)

॥ব॥

২৩. আল-বাগাওয়ী : রুকুনুদ্দীন, মুহয়িউস সুন্নাহ, আবু মুহাম্মদ, আল-হুসাইন ইবনে মাস'ঊদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল ফার্‌রা আল-বাগাওয়ী আশ-শাফিয়ী (৪৩৬–৫১০ হি. = ১০৪৪–১১১৭ খ্রি.), ***মা'আলিমুত তানযীল ফী তাফসীরিল কুরআন***, দারু ইয়াহইয়া আত-তুরাস আল-আরবি, বয়রুত, লেবনান (১৪২০ হি. = ১৯৮৩ খ্রি.)

২৪. আল-বায়হাকী : আবু বকর, আহমদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মুসা আল-আল-খুসরাজিরদী আল-খুরাসানী আল-বায়হাকী (৩৮৪–৪৫৮ হি. = ৯৯৪–১০৬৬ খ্রি.), ***দালায়িলুন নুবুওয়াত ওয়া মারিফাতু আহওয়ালি সাহিবিশ শরীয়ত***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

২৫. আল-বায়হাকী : আবু বকর, আহমদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মুসা আল-আল-খুসরাজিরদী আল-খুরাসানী আল-বায়হাকী (৩৮৪–৪৫৮ হি. = ৯৯৪–১০৬৬ খ্রি.), ***আয-যুহদুল কবীর***, মুআস্‌সাসাতুল কুতুব আস-সাকাফিয়া, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৬ হি. = ১৯৯৬ খ্রি.)

২৬. আল-বুখারী : হিবরুল ইসলাম, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনুল মুগীরা আল-বুখারী

(১৯৪–২৫৬ হি. = ৮১০–৮৭০ খ্রি.), ***আল-জামিউল মুসনদ আস-সহীহ আল-মুখতাসার মিন উমূরি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি = আস-সহীহ***, দারু তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০১ খ্রি.)

॥ম॥

২৭. মুসলিম : আবুল হাসান, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম আল-কুরায়শী আন-নায়শাপুরী (২০৪–২৬১ হি. = ৮২০–৮৭৫ খ্রি.), ***আল-মুসনদুস সহীহিল মুখতাসার বি-নাকলিল আদলি আনিল আদলি ইলা রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম = আস-সহীহ***, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান

২৮. মুহাম্মদ রশীদ রেযা: মুহাম্মদ রশীদ ইবনে আলী ইবনে রিযা ইবনে মুহাম্মদ শামসুদ্দীন ইবনে মুহাম্মদ বাহাউদ্দীন ইবনে মুনলা আলী খলীফা আল-কালমূনী আল-হুসাইনী (১২৮২–১৩৫৪ হি. = ১৮৬৫–১৯৩৫ খ্রি.), আল-হাইয়াতুল মিসরিয়া আল-আম্মা লিল কিতাব, কায়রো, মিসর (১৪১০ হি. = ১৯৯০ খ্রি.)

২৯. মুফতী মুহাম্মদ শফী: মুফতীয়ে আযম, মুহাম্মদ শফী ইবনে ইয়াসীন ইবনে খলীফা তাহসীন আলী ইবনে মিয়াজী ইমাম আলী ইবনে মিয়াজী হাফিজ করীমুল্লাহ ইবনে মিয়াজী খায়রুল্লাহ ইবনে মিয়াজী শুকরুল্লাহ ওসমানী (১৩১৪–১৩৯৫ হি. = ১৮৯৭–১৯৭৬ খ্রি.), ***তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন***, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (নবম সংস্করণ: ১৪৩৩ হি. = ২০১২ খ্রি.)

॥শ॥

৩০. শিবলী নু'মানী : মুহাম্মদ শিবলী ইবনু হাবীব আন-নু'মানী, ***সীরাতুন্নবী*** (১২৭৪–১৩৩২ হি. = ১৮৫৭–১৯১৩ খ্রি.) ইদারায়ে ইসলামিয়াত, লাহোর, পাকিস্তান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪২৩ হি. = ২০০২ খ্রি.)

॥স॥

৩১. কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী: মাওলানা কাযী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ পানিপথী আল-উসমানী আল-মাযহারী (১১৪৩–১২২৫ হি. = ১৭৩০–১৮১০ খ্রি.), ***আত-তাফসীরুল মাযহারী***, মকতাবায়ে রশিদিয়া, করচি, পাকিস্তান (১৪১২ হি. = ১৯৯১ খ্রি.)

৩২. শায়খ সা'দী : শায়খ, মুসলিহ উদ্দীন, শরফুদ্দীন ইবনে আবদুল্লাহ সাদী আশ-শীরাযী (৫৮০–৬৯১ হি. = ১১৮৪–১২৯২ খ্রি.):

– ***বোস্তাঁ***, ইন্তিশারাতে ইকবাল, তেহরান, ইরান (প্রথম সংস্করণ: ১৩৮৯ হি. শা. = ২০১০ খ্রি.)

– ***গযলিয়াতে সা'দী***, ইন্তিশারাতে ইকবাল, তেহরান, ইরান (প্রথম সংস্করণ: ১৩৮৯ হি. শা. = ২০১০ খ্রি.)

৩৩. সিদ্দীক হাসান খান: আবুল তাইয়িব, খান বাহাদুর, নবাব, মুহাম্মদ সিদ্দীক ইবনে হাসান ইবনে আলী ইবনে লুতফুল্লাহ আল-হুসায়নী আল-বুখারী আল-কিন্নুজী (১২৪৮–১৩০৭ হি. = ১৮৩২–১৮৯০ খ্রি.), ***ফাতহুল বয়ান ফী মাকাসিদিল কুরআন***, মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪১২ হি. = ১৯৯২ খ্রি.)

৩৪. আস-সুয়ুতী : জালাল উদ্দীন, আবুল ফযল, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর আস-সুয়ুতী (৮৪৯–৯১১ হি. = ১৪৪৫–১৫০৫ খ্রি.):

– ***আল-খাসায়িসুল কুবরা***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান

– ***তা'য়ীদুল হাকীকাতিল আলিয়া ওয়া তাশয়ীদুত তারীকাতিশ শাযিলিয়া***, আল-মাতবাআতুল ইসলামিয়া, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৩৫২ হি. = ১৯৩৫ খ্রি.)